চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নব অবদান

আর্মেনগার্ড ইবার্ল

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের
নব অবদান

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের
নব অবদান

Modern Medical Discoveries নামক
ইংরেজি পুস্তকের অনুবাদ)

আর্মেনগার্ড ইবার্ল

অশোক পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

জীবনত্রাতা-পেনিসিলিন ১
বিশ্বজনীন সালফা ওষুধ ৫৪
এ যুগের নতুন জীবাণু নাশক ৭৩
নবজীবনের স্পন্দন ৯১
শোণিত প্রবাহের আরো রহস্য ১১০
বীজাণুর প্রতিষেধ ব্যবস্থা ১২০
খাদ্যপ্রাণের সন্ধানে ১৪৮
ভবিষ্যতের তোরণ ১৬৩

জীবন-ত্রাতা—পেনিসিলিন

বৃত্তি নির্বাচন

স্কটল্যাণ্ডের নিচু অঞ্চলে লকফিল্ড গ্রাম। সেখানে এক গোলাবাড়িতে হিউ ফ্লেমিং পরিবারের বাস। তারা এমনি নিরীহ ও নির্বিরোধ ছিল যে তাদের এক ঐ গাঁয়ের লোক ছাড়া প্রায় কেউই চিনত না, আর বড় জোর চিনত আশ-পাশের এক আধ খানা গাঁয়ের লোক। তাদের একটি ছেলে ছিল, নাম আলেকজাণ্ডার। ১৮৮১ সালে সে জন্মায়।

কিশোর আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং চাষী পরিবারের ছেলে। সে কী আর করবে ক্ষেত-খামারের কাজ ছাড়া? তাই সে তার

বাবাকে হয়ত শস্যের রোয়া-কাটা-ঝাড়ায় সাহায্য করত, নয়ত খামারের গরু ঘোড়াগুলোর দেখাশুনো করত। কিন্তু এসব কাজের মধ্যেও তার মনটা উন্মুখ হয়ে থাকত—কখন ছুটি মেলে, কখন পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গিয়ে খেলতে পারবে!

গাজ করতে করতে বা খেলতে খেলতে অনেক সময় হয়ত তার মনে হয়েছে—

আচ্ছা, বড় হয়ে আমি কী হব?

কী হলে ভাল হয়?

কিন্তু সে যে বড় হয়ে কী হবে তা কি আর সে জানত? জানলে অবাক হয়ে যেত। যদি সে ঘুণাক্ষরেও একবার বুঝতে পারত একদিন সে সারা দুনিয়ার লোকের কী এক মহা উপকার করবে, তাহলে সে নিশ্চয়ই বেশ গর্ব অনুভব করত!

কিন্তু হায়, আমাদের এই কিশোরটির মনে এ আভাস বিন্দুমাত্রও পৌঁছায়নি। তবে সে বেশ বুদ্ধিমান ছিল, আর তার চারদিকে কী ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে তার কৌতূহল ছিল প্রচুর।

একদিন এই কিশোর আলেকজাণ্ডার পল্লীর নির্জন পথ ধরে আনমনে একা একা চলেছে, এমন সময় দেখে কি, ঐ অঞ্চলের ডাক্তার যাচ্ছেন তাঁর বগি-গাড়ি হাঁকিয়ে। অমনি তার মাথায় খেলে গেল—

আচ্ছা, ঐ রকম ডাক্তার হলে কেমন হয়?

আর তার মন চলে গেল ডাক্তার যে সব রোগী দেখতে যাচ্ছেন তাদের চিন্তায়,

আহা! সে বেচারারা কতই না ভুগছে! ডাক্তারও কতই না চেষ্টা করছেন তাদের সারাতে!

তার মনে পড়ল—

মা-বাবার কাছে শুনেছে কত লোক নাকি অসুখ হয়ে মারাই গিয়েছে, ডাক্তারও সে সব রোগ সারিয়ে উঠতে পারেন নি। কী এমন রোগ যে ডাক্তারেরও অসাধ্য হল? আহা রে! সে বেচারারা কত কষ্ট পেয়েই না মরেছে!

তাদের মৃত্যুর কথা মনে পড়তেই দুঃখ-বেদনায় ভরে ওঠে তার দরদি কিশোর মন। সে ভাবত—

আচ্ছা, এমন একদিন কি আসবে না, যেদিন ডাক্তাররা রোগ সম্বন্ধে আজ যা জানেন তার চেয়েও অনেক, অনেক বেশি জানবেন? আজ থেকে দশ-বিশ বছর পরে তাঁরা কি এখনকার থেকে অনেক বেশি রোগী সারাতে পারবেন না?

আবার হয়ত সে ভাবত—

আচ্ছা, এই রোগগুলো কী জিনিস? এদের কী এমন শক্তি আছে যাতে মানুষকে একেবারে মেরে ফেলতে পারে?

কিন্তু বাড়িতে এমন কাউকে সে পেত না, যার কাছে সে এসব প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর পায়।

যাহোক, আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ছেলেবেলায় বেশ বুদ্ধিমান ও চটপটে ছেলে ছিল। এসব দেখে তার বাবা তাকে পাঠালেন 'কিল্‌মারনক্‌ একাডেমি'তে পড়তে। সেখানে সে সিনিয়র স্কলারশিপ বা সর্বোচ্চ বৃত্তি লাভ করল, আর কতকগুলি অন্য পারিতোষিকও পেল তার কৃতিত্বের জন্যে। এইসময় পড়াশুনায় তার যেমন আগ্রহ ছিল, খেলাধুলাতেও ছিল তেমনি উৎসাহ। আমাদের ছেলেদের কাছে ফুটবল খেলাটি যেমন খুব প্রিয়, ইংরাজ ও স্কচ বালকদের কাছে তেমনি ভাল লাগে রাগবি। এই রাগবি খেলাতেই আলেকজাণ্ডারের খুব ঝোঁক দেখা যেত।

ক্রমে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে অসাধারণ

কৃতিত্ব দেখিয়ে। ইস্কুলের পাঠ তার শেষ, এখন বাকি উচ্চতর শিক্ষা। তার বাবা চাইলেন তাকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে। এই নিয়ে হিউ ফ্লেমিং আর ছেলে আলেকজাণ্ডারের আলোচনা চলল :

তার বাবা প্রশ্ন করলেন—

হ্যাঁ, কোন্ ধরণের বৃত্তি তুমি বেছে নিতে চাও শুনি! কিছু ঠিক করেছ কি?

আলেকজাণ্ডারের চিত্তের অতল গভীরে এতদিন ধরে বয়ে চলেছিল এক বিশেষ চিন্তার ফল্গু-ধারা। সেই সব ব্যাধির চিন্তা—যা মানুষকে করে তোলে বিপন্ন, মানুষের ঘটায় মৃত্যু। তাই এই সব ভেবে ভেবে মনে মনে সে একটা সিদ্ধান্তও করে রেখেছিল। এখন যেমনি তার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন অমনি সে বলে উঠল—

আমি ডাক্তার হতে চাই বাবা।

তার বাবারও মনে হল—বাঃ। এত বেশ একটা চমৎকার পেশা! উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। তখন ছেলের সঙ্গে তিনি পাঁচ-সাতটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা পাড়লেন, আলোচনা করতে লাগলেন কোথায় গেলে তার ভাল হয় না-হয়।

শেষে ঠিক হল আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ইংলণ্ডেরই কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাবে। সেখানে যেমন ভাল ভাল মেডিক্যাল স্কুল আছে, স্কটল্যাণ্ডে তেমন নেই। তাঁরা বাছ-বিচার করতে লাগলেন—

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়টা দেখা যাচ্ছে চিকিৎসা বিভাগের জন্যে বিখ্যাত। আর 'বার্টস'এ এমন একটা মেডিক্যাল স্কুল আছে' যা 'সেণ্ট্ বার্থলোমিউ' হাসপাতালের চেয়ে বেশি নাম করা। তাছাড়া 'বার্টস'এর মত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট আর একটা হাসপাতাল আছে—সেটা হল প্যাডিংটনে।

আলেকজাণ্ডার 'সেণ্ট্ মেরী'র ইস্কুলেই যাবে ঠিক হল। এটার প্রতি তার একটু বেশি আকর্ষণ অন্য কারণেও ছিল—সেটা এই যে, এ ইস্কুলটা রাগবি খেলা জেতায় বরাবর বেশ সুনাম রেখে আসছিল।

সৌভাগ্যের বিষয়—'সেণ্ট মেরী'তে তখন অনেকগুলি বেশ ভাল ভাল শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আল্‌ম্রথ রাইট। এই শিক্ষকদের সুশিক্ষণে আলেকজাণ্ডার দিন দিন লেখাপড়ায় বেশ উন্নতি করতে লাগল। খেলাধূলায় তার ভালবাসা আগের মতই রইল বটে। কিন্তু তার অন্তরে বেশির ভাগ স্থান জুড়ে রইল চিকিৎসা-বিজ্ঞান!

আলেকজাণ্ডারের পড়াশুনা বেশ এগিয়ে চলেছে। এ্যানাটমি (শরীর-তত্ত্ব), ব্যাক্টিরিওলজি (জীবাণুতত্ত্ব), মেডিসিন (ভেষজ-বিজ্ঞান) ও সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে সে গভীর থেকে গভীরতর জ্ঞান লাভ করে চলল। নিত্য নিত্য অধ্যয়ন-লব্ধ জ্ঞান তার মনকে শুধু পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, তার বাইরেও অভিনব মহত্তর আবিষ্কারের কল্পনায় তাকে বিভোর করে তুলত। অনেক সময় যখন সে মনে মনে বুঝত এই সব বিস্তার আরো বেশি গবেষণা প্রয়োজন, তখন সে নিজেই একদিন না হয় এই দায়িত্ব নেবে। এমনি কল্পনা করে বসত, আর মনে মনে উৎসাহে খুব মেতে উঠত। এইভাবে তার শিক্ষা-জীবন ক্রমে একদিন সমাপ্ত হল। সেণ্ট্ মেরী থেকে বার হয়ে আসবার সময় ঐ ইস্কুলের মেধাবী ছাত্রের যোগ্য সমস্ত সম্মানগুলিই সে লাভ করে বেরুল—আর সহপাঠিদের কাছে সে হল এক বিস্ময়ের বস্তু।

তার শিক্ষকেরা বিশেষ করে—স্যার আলম্রথ্ রাইট তার শিক্ষার অগ্রগতি বেশ সাগ্রহে লক্ষ করে আসছিলেন। শেষে তরুণ ফ্লেমিং স্নাতক হয়ে বেরিয়ে আসবার সময়

জীবাণুতত্ত্ব বিষয়ে উৎকৃষ্ট উত্তর দেওয়ার জন্যে ঐ বিষয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশেষ বৃত্তি লাভ করল। উপরন্তু সর্ব বিষয়ে তার ভাল ফল দেখে কর্তৃপক্ষ তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক করে নিলেন ও গবেষক-মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য নির্বাচিত করলেন।

যুবা বয়সে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং কেমন মানুষ ছিল এ জানতে আমাদের কৌতূহল হয় না কি? যুবক আলেকজাণ্ডার কিছুটা খর্বাকার হলেও বেশ বলিষ্ঠ পুরুষ ছিল। তার নীল চক্ষু দুটি ঘন আঁখি-পল্লবের অন্তরালে কী উজ্জ্বলই না দেখাত! তার মুখমণ্ডলে ছিল এক অপূর্ব গম্ভীর চিন্তাবিষ্ট ভাব, আর সে মুখে ফুটে উঠত একটা অদ্ভুত সজীবতা এবং ঐকান্তিক আগ্রহ। তার মুখ দেখলেই বোঝা যেত সে যেন তার জীবনযাত্রায় বেশ তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট।

বহুদিন আগে ছেলেবেলায় এই আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংই একবার নিজের মনে প্রশ্ন করেছিল না, 'আমি কী হব'? আজ দেখা যায় তার জীবনে সে সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়েছে। চিকিৎসক হয়ে জীবনে দাঁড়াবার তার সেই যে স্বপ্ন, তা আজ এতদিনে সফল ও সার্থক হয়েছে।

মরণদূতদের মুখোমুখি

তখন ১৯১৪ সাল। তরুণ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং সবে মাত্র তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় ও হাসপাতালের কাজে যোগ দিয়েছেন। এমন সময় বেজে উঠল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে নাম লেখালেন, যুদ্ধ করতে নয়, চিকিৎসা করতেই। কেননা তিনি জানতেন যুদ্ধে আহত

সৈনিকদের চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের খুব বেশি দরকার হবেই। 'রয়্যাল আর্মি মেডিক্যাল কোর'-এ তাঁর নিয়োগ হয়ে গেল, আর তাঁকে পাঠানো হল ফ্রান্সে, বুলোনের হাসপাতালে কাজ করতে।

এই ব্যাপারে যে সব ডাক্তাররা এসেছিলেন তাঁদের কাজটি বড় কম গুরুতর ছিল না। যুদ্ধ-সীমান্ত থেকে যে সব আহত ও পীড়িতদের হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছিল তাদের জীবন রক্ষার জন্য এঁদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হচ্ছিল। এই যমে-মানুষে লড়াইএ এঁদের অস্ত্র ছিল কেবল চিকিৎসা-বিদ্যার জ্ঞান আর ওষুধ-পত্র। এর মধ্যে তাঁদের আবার সব চেয়ে কঠিন পাল্লা ছিল জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

যুদ্ধে বোমা, বন্দুক ও নানা মারণাস্ত্রে অবশ্য বহু লোক আহত হত, কিন্তু তাদের অনেকেই বোধহয় বেঁচে যেতে পারত যদি জীবাণু-দুষ্টি না ঘটত। জীবাণু-দুষ্টি ব্যাপারটি এই যে, ক্ষতে জীবাণু ঢুকে পড়ে ঘা-টাকে বিষিয়ে দেয় ও পচ ধরায়। এটাই একটা ভীষণ মারাত্মক ব্যাপার, এতে ক্ষত সারবার উপায় ত থাকেই না, রোগীরও প্রাণান্ত হয়।

এখন এই জীবাণু-দুষ্টি কী করে ঘটে তা দেখা যাক। যে স্থানটি হয়ত অস্ত্রাঘাতে অথবা গুলি-বারুদে পুড়ে ক্ষত হয়েছে সেই ক্ষতের খোলা মুখ দিয়ে ঢুকে পড়ে দুরন্ত জীবাণুর দল ক্ষতস্থানটি বিষিয়ে তোলবার চেষ্টা করে। শুধু তাই-নয়, ফুসফুস পাকস্থলী, রক্ত-সংবহন-তন্ত্র এ সব জায়গায় আবার এমনিই কতকগুলি জীবাণু থাকেই। যদি আহত লোকটি আঘাত থেকে বেশি রক্ত ঝরার দরুন দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে সেই সুযোগে এই জীবাণুগুলি খুব বেশি সংখ্যায় বেড়ে উঠতে থাকে, আর

শরীরের ভেতর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। এই রোগ-জীবাণুগুলিই জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় মৃত্যু-দূত। দেখা গিয়েছে এরা ভয়াবহ যুদ্ধাস্ত্রগুলির চেয়ে বেশি মাত্রায় হত্যা-লীলা চালায়।

এই যে সাঙ্ঘাতিক জীবাণুদের কথা বলা হল এরা যখন মানুষের শরীরে ঢোকে তখন এই রকম একটা ব্যাপার চলতে থাকে; জীবাণুগুলি এসে হয় ত্বকের ভিতর নয়ত শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতে আশ্রয় নেয়, আর সেখান থেকে তারা সারা দেহে ছড়াতে থাকে। এগুলি হয়ত টাইফাস (সান্নিপাত) ডিপথিরিয়া (গলক্ষত) ইত্যাদির মারাত্মক জীবাণু অথবা এমন সব জীবাণু যারা ক্ষতকে বিষিয়ে তুলতে বেশ সক্ষম। এই জীবাণুগুলিই হল আক্রমণকারী শত্রু, এদের নিপাতই হল সব চেয়ে বড় সমস্যা। এরা যেই মানুষের দেহে এসে ঢোকে অমনি দেহের ভেতর এদের রুখবার জন্যে একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু কিভাবে মানুষের শরীর এদের সঙ্গে লড়াই করে সেও এক আশ্চর্য ব্যাপার। মানুষের শরীরে যে শ্বেত রক্ত-কণিকা আছে তাদের সাহায্যে শরীর জীবাণুদের সঙ্গে যুঝতে থাকে। এই শ্বেত রক্তকণিকাগুলি যুদ্ধ-সীমান্তে ধাবমান সৈন্যদলের মত সংগ্রাম করতে ছোটে।

এই অদ্ভুত স্বাভাবিক শরীর-রক্ষী বাহিনীকে অহোরাত্র আক্রমণকারী জীবাণুগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। কেননা জীবাণু-গুলি কেবলই শরীরে এসে ঢুকছে—যে সব জিনিস আমরা স্পর্শ করি তার মাধ্যমে। যেমন আমরা যা কিছু মুখে পুরি তাই শরীরের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। যাহোক, জীবাণু ও শ্বেত রক্ত-কণিকার যে সংগ্রাম, তাতে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্বেত রক্তকণিকারাই জয়ী হয়। অবশ্য কখনো কখনো আক্রমণকারী

জীবাণুরা খুব প্রবল থাকে, তখন তারা শ্বেত রক্তকণিকাদের পরাজিত করে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে।

১৯১৪ সাল নাগাদ কতকগুলি ভাল দুষ্টি-প্রতিষেধক ওষুধ চলিত ছিল। গত শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু পরে 'লিস্টার' সাহেব এই ওষুধগুলির আবার উন্নতি করারও কিছু উপায় দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি একদিন আবিষ্কার করলেন কতকগুলি দ্রব পদার্থ, আর অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার করা হয় এমন কতকগুলি রসায়নিক পদার্থ যা ক্ষতের দুষ্টি বা বিষাক্ত হওয়াটা ঠেকাতে পারে। তারপর, পাস্তুর, কক্ ও আরো কয়েকজন [illegible] বড় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছিলেন যত কিছু দুষ্টি ব্যাধির উদ্ভব ঐ জীবাণু থেকেই হয়। আর এই সব রোগ-জীবাণুদের সম্বন্ধে পাঁচ-রকম দরকারি তথ্যও তাঁরা আবিষ্কার করে ফেলেন। কিন্তু অনেকগুলি খুব সাধারণ অথচ সবচেয়ে বিপজ্জনক রোগের কোন উপকারী ওষুধ তাঁদের জানা ছিল না। এই রোগগুলির মধ্যে প্রধান একটি রক্ত-দুষ্টি, যা যুদ্ধকালে শত শত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বুলোন হাসপাতালে ডাঃ ফ্লেমিং ও অন্যান্য চিকিৎসকরা এতদিন ক্ষতদুষ্টি বন্ধ করতে বাইরে থেকে লাগাবার এক রকম প্রলেপ বা মলম ব্যবহার করে আসছিলেন। কিন্তু যদি জীবাণুগুলি বেশি প্রবল হত বা রক্তপ্রবাহের মধ্যে ঢুকে পড়ত—আর এরকম প্রায়ই ঘটত, তাহলে আর মানুষকে বাঁচাবার কোন উপায় থাকত না। ফলে রক্তদুষ্টি থেকে মরণ একেবারে অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াত।

ডাক্তারদের মনে হল, মুখ-বিবর দিয়ে পাকস্থলীতে অথবা ইনজেকশন মারফত রক্তের ভিতরে যদি বিষ-প্রতিষেধক

একটি ওষুধ ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে সে ওষুধটি বোধ হয় জীবাণুদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, তা করবার ত বিশেষ সুবিধা নেই, কারণ বিষ-প্রতিষেধক ওষুধটাই যে রোগ-নিবারক না হয়ে নিজেই বিষক্রিয়া করতে থাকে। তার ফলে সেই বিষে রোগ-জীবাণুগুলি হয়ত মরতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রোগীরও অন্তিম ঘনিয়ে আসে।

বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক পল আর্লিকের মনে হয়েছিল, যে-সব পদার্থ শরীরের ভিতরে গিয়ে রোগ-জীবাণুদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের বিনষ্ট করতে পারে এমন বেশ একটি প্রতিষেধক ওষুধ বানানো সম্ভব। এই রকম একটা পদার্থ আবিষ্কার করে তিনি একটি প্রাথমিক ওষুধ বানালেন বটে, কিন্তু তা সব রকম রোগের চিকিৎসায় ঠিক কার্যকরী হল না। কাজেই তিনি গবেষণা চালিয়ে চললেন। ১৯১৫ সালে আর্লিক মারা যান। আর তাঁরই নির্দিষ্ট পথে যে সব বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা বহুদিন পর্যন্ত সর্বরোগে উপকারী কোন দ্রব্যের সন্ধান পেলেন না। কাজেই তখনো পর্যন্ত বাইরে থেকে প্রয়োগ করা যায় এমন বিষ-প্রতিষেধক দ্রব্যই একমাত্র জীবাণুনাশক ঔষধ হয়ে রইল।

এদিকে যুদ্ধের সময় দুষ্টি-প্রতিষেধক ওষুধের খুব বেশি প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগল। কাজেই তখন ডাঃ ফ্লেমিংকে বলা হল তিনি যেন প্রচলিত ওষুধের চেয়ে অধিকতর কার্যকরী কোন একটি ভাল প্রতিষেধক-ওষুধ আবিষ্কার করার কথা চিন্তা করেন। হাসপাতালে রোগী দেখার কাজ করতে করতেই—কখনো বা তাঁর সংক্ষিপ্ত অবসরটুকুর ফাঁকে ডাঃ ফ্লেমিং এই ওষুধ আবিষ্কারের কথাই সর্বদা চিন্তা করতে লাগলেন।

একদিন হাসপাতালে রোগী তদারক করে ঘুরতে ঘুরতে

ডাঃ ফ্লেমিং ক্ষত-দুষ্টিতে মুমূর্ষ এক রোগীর বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। এই রোগীর ক্ষতটা ত দূষিত হয়েছেই, তাছাড়া সারা শরীরেই উঠেছে ভয়ানক বিষিয়ে। এইভাবে তিনি যে কয়েকশত রোগীকে সেদিনই মরণের কোলে ঢলে পড়তে দেখেছেন এ হতভাগ্য তাদেরই একজন। ডাঃ ফ্লেমিং তাকে দেখে নিজের অক্ষমতায় নিজের ওপরই যেন আক্রোশে ফুঁসতে লাগলেন।

এই রকম সব মানুষদের বাঁচানোর জন্য কোন ওষুধ নিশ্চয় আমাদের আবিষ্কার করতে হবে—গর্জে উঠলেন তিনি নিজের মনে।

কেন, আমাদের মস্তিষ্কে কি যথেষ্ট ধার নেই? মাথা খাটিয়ে কি এমন একটা উপায় করতে পারব না, যাতে এই সব হত-ভাগ্যেরা মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচতে পারে?

তাঁর আরো মনে হল—হায়, তিনি কিম্বা অন্য কোন বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসক কেউ যদি এমন একটি ওযুধ আবিষ্কার করতে পারেন যা রক্তস্রোতের মধ্যে গিয়ে জীবাণুদের সঙ্গে লড়তে পারে, তবেই এই সব দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়!

তিনি নানাবিধ গবেষণা ও পরীক্ষার কাজে লেগে গেলেন। ক্ষতে বিষ-প্রতিষেধক ওষুধ আরোপ করলে সেটি যখন রক্তের সংস্পর্শে আসে তখন প্রকৃত ব্যাপারটা ঠিক কী রকম ঘটে তা আগে তিনি জানতে চাইলেন। তাঁর উদ্দেশ্য এই যে, তিনি বুঝে নেবেন কেন এই ওষুধই শরীরের ভিতর সঞ্চার করলে তা এমন মারাত্মক হয়ে ওঠে।

তাই ডাঃ ফ্লেমিং এক অভিনব পরীক্ষায় অগ্রসর হলেন। তিনি একটা কাঁচের প্লেটের ওপর এক ফোঁটা রক্ত রাখলেন, আর তাতে অল্প একটু প্রতিষেধক-ওষুধ মেশালেন। অণুবীক্ষণের নিচে কাঁচের

প্লেটটি রেখে তিনি দেখতে লাগলেন ফলটা কী রকম দাঁড়ায়। তিনি দেখলেন, যে শ্বেত রক্তকণিকারা জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে তাদেরই আগে ধ্বংস করে ফেলল তাঁর এই বিষ-প্রতিষেধক ওষুধটা! ব্যাপার বুঝতে পেরে তিনি বলে উঠলেন—

ও:! তাহলে এটাই এতদিন অসুবিধা ঘটাচ্ছিল! তাহলে নিশ্চয় এই ধরণের যে কোন রকম পদার্থই যা শ্বেত-রক্তকণিকার ক্ষতি করতে পারে তা দিয়ে আর প্রতিষেধক ওষুধের কাজ চলবে না। কেননা, ওটা তখন আর সহায়ক ওষুধ না হয়ে নিজেই একটা ক্ষতিকর বিষ হয়ে উঠবে, আর সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মরণকে আনবে ঘনিয়ে!

ভাবতে থাকেন ডাঃ ফ্লেমিং—

নিশ্চয় অন্য কোন রকম একটা প্রতিষেধক ওষুধ আছে যার স্বরূপ ভিন্ন ধরণের, তা এমন একটা কিছু, যা মনুষ্যদেহের রক্তকোষ ও বিধানতন্তুগুলির ক্ষতি করবে না। কেবল রোগ-জীবাণুই ধ্বংস করবে।

কিন্তু! কিন্তু, এমন ওষুধ পাওয়া যায় কী করে? ভাবতে লাগলেন ডাঃ ফ্লেমিং। তাঁর মনের মধ্যে দিয়ে চিন্তার পর চিন্তা স্রোতের মত বয়ে যেতে লাগল—

প্রকৃতি রাজ্যের নানা রাসায়নিক দ্রব্যের রহস্য ত অপরিসীম! তা ছাড়া এই মনুষ্যদেহের রহস্যও ত কম বিচিত্র নয়! আর ভিন্ন ভিন্ন জীবাণুদের স্বভাব ও আচরণ কী ভয়ানক জটিল! তাদের কেউ যে সম্পূর্ণ বুঝতে পারে তা তো মনে হয় না। কাজেই যদি কেউ জীবাণু ধ্বংসের উপায়ের একটা সামান্য অংশও আবিষ্কার করতে চায় তবে তাকে বোধ হয় একটা গোটা জীবনই গবেষণাগারে অনুসন্ধান ও পরীক্ষার কাজে কাটাতে হবে।

কিন্তু! কিন্তু, ডাঃ ফ্লেমিং এখন যে ফ্রান্সের এই হাসপাতালে চিকিৎসার কাজে পুরো-দস্তুর ব্যস্ত! কোথায় তাঁর অবসর, কোথায় সেই সব মূল্যবান সময়ের সুযোগ—এই জীবাণু-ধ্বংসী মহৌষধ আবিষ্কারে নিশ্চিন্ত হয়ে ডুব দিতে পারেন!

তাই, এখন আর কী করতে পারেন তিনি, বড় জোর পারেন—এ সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে থাকা; এ ছাড়া আর উপায় কই! আর তাতেই নিয়োজিত হলেন ডাঃ ফ্লেমিং। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে তাঁর খালি ঐ এক চিন্তা, এ চিন্তা তাঁর মন-ছাড়া হল না। সদা-সর্বদা সেই এক সমস্যা তাঁর মনের মধ্যে জেগে থেকে তাঁকে সমাধান খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল।

১৯১৮ সালে ঘটল মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি, মহাযুদ্ধের অল্প পরেই নিঃশেষ হয়ে এল ডাঃ ফ্লেমিংএর বুলোন-হাসপাতালে কাজের প্রয়োজন। ফিরে এলেন তিনি আবার ইংলণ্ডে আর শীঘ্রই এসে হাজির হলেন 'সেণ্ট্ মেরী'র হাসপাতালে ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সময় তিনি দার-পরিগ্রহ করলেন ও নিত্যকার তালিকানুযায়ী তাঁর দৈনন্দিন কাজ করে চললেন মনের আনন্দে। আজ তিনি শান্তিময় গার্হস্থ্য জীবনে নিশ্চিন্ত নিমগ্ন। তাঁর দিনগুলির মাধুর্যকে যেন আরো বাড়িয়ে তুলতেই জন্মলাভ করল এক পুত্র-সন্তান।

ডাক্তার ফ্লেমিং-এর জীবনে নেমে এল এক অনাবিল সুখ-শান্তির প্রবাহ। আর সেই শান্তিময় জীবনের নির্ঝঞ্ঝাট অবকাশে অন্তত কিছুটা সময় তিনি তাঁর সেই প্রিয় ও প্রয়োজনীয় কাজে নিয়োগ করতে পারলেন। সে কাজটি সেই জীবাণু-নাশক গবেষণা ভিন্ন আর কী! সেটি যে তাঁর মনের মধ্যে তখনো প্রতিনিয়ত ঘোরাফেরা করছিল! কেননা, যুদ্ধ-ক্ষতের সেই ভয়াবহ বিষ-দুষ্টির স্মৃতি ও তার করালগ্রাসে শত শত জীবন-লোপের বিভীষিকা তাঁর

মন থেকে যে তখনো কিছুমাত্র মুছে যায়নি! যে দুষ্টি-প্রতিষেধক ওষুধটির কথা তিনি এতদিন ভেবে এসেছেন সেইটাই ত তিনি বার করতে চাইছিলেন—সেটা এমন একটা ওষুধ হওয়া চাই যা ভেতরে সঞ্চারিত হয়ে গিয়ে জীবাণু নাশ করবে, অন্তত তাদের দুর্বল করে দেবে, অথচ বিধানতন্তু কিম্বা শোনিত-প্রবাহেরও কোন ক্ষতি করবে না। তাই তার মনে হল জীবাণু-ধ্বংসী কোন পদার্থ আবিষ্কার হলে তা মানুষকে শুধু রক্ত-দুষ্টি থেকেই বাঁচাব না, অন্য অনেক প্রাণনাশক রোগ থেকেও বাঁচাবে।

হয়ত যে সময়টা তাঁকে মেডিক্যাল-স্কুলের যুবকদের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিতে হচ্ছে না, সে সময় তিনি এই আবিষ্কারের কাজে মনোযোগ দিতেন। আর আর বৈজ্ঞানিকরাও এই পথে কে কতদূর কী করেছেন তার বিবরণগুলিও তিনি না পড়ে ছাড়তেন না। আর তিনি স্বয়ং কাজ করে চলেছিলেন সেণ্ট মেরীতে। আপনার ছোট্ট গবেষণাগারে। এই গবেষণাগারটি কিন্তু সেকেলে ধরণের ছিল। এর দেয়ালের গায়ে বাদামি রঙ-করা তাক ছিল, আর ছিল একটা জীর্ণ টেবিল ও তেমনি একখানা বেঞ্চি। আর গবেষণায় দরকারি জিনিস-পত্রের সরঞ্জামও ছিল যৎসামান্য।

যদি তিনি সেই ছাত্রজীবনের প্রথমে বিদ্যালয় নির্বাচনকালে 'বার্টস' অথবা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতেন তাহলে হয়ত আজ তিনি জগতের এক আধুনিকতম ও চরম সুসজ্জিত গবেষগারে কাজ করার সুযোগ পেতেন আর অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সহায়তাও লাভ করতে পারতেন। কিন্তু এখন তাঁর ভাগ্যে যেমন জুটছে তাতে তাঁকে অনেক সুযোগে বঞ্চিত হয়েই কাজ করতে হচ্ছিল। আর তাঁর সহায়ক হিসাবে ছিল মাত্র তাঁর কয়েকজন তরুণ ছাত্র।

তারা এসব বিষয়ে যথোচিত শিক্ষিতও ছিলনা, তবে তারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও আগ্রহশীল ছিল।

কাজ করে চলেছেন ডাঃ ফ্লেমিং। অনেক কিছুই তিনি ইতি-মধ্যে করে ফেলেছেন যা আর কারো কাছে বিশেষ ভাঙেন নি, শুধু কেবল দিনের পর দিন নিজে পরীক্ষা করে যাচ্ছেন। এই কয়েক বছরের মধ্যে কিছু কিছু আকর্ষণযোগ্য আবিষ্কার তিনি করে ফেলতে পারলেও এমন কিছু এখনো বার করে উঠতে পারেননি যা এই রোগ-জীবাণু-ধ্বংসে অমোঘ হবে। এইগুলির মধ্যে তাঁর একটা আবিষ্কার হল মানুষের চোখের জলে এবং ডিমের সাদা অংশে জীবাণু-নাশক পদার্থের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা। কিন্তু বেশি মারাত্মক জীবাণুদের ধ্বংস করতে এখনো বিশেষ কাজে লাগল না। তাই যদিও তিনি এই আবিষ্কারের বর্ণনা দিয়ে বিবরণ একটা লিখলেন, তাও তাঁর মনে হল আসলে যে জিনিস তিনি খুঁজছেন তা এ নয়। কাজেই ডাঃ ফ্লেমিং আরো নানারকম পরীক্ষা করে চললেন।

দশবছর ধরে গবেষণা চালিয়ে আসছিলেন ডাঃ ফ্লেমিং। সেবার ১৯২৮ সালের শরতকালে তিনি 'স্ট্যাফিলোককাস' বা সংক্ষেপে 'স্টাফ্' নামক একপ্রকার জীবাণু সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। এই জাতীয় জীবাণুগুলির ভিতর একটা শ্রেণী আছে যারা রক্ত-দুষ্টি ঘটিয়ে থাকে আর খুব ভয়াবহ না হলেও বেশ যন্ত্রণাদায়ক ফোড়া প্রভৃতির সৃষ্টি করে, কতকগুলি আবার মেনিঞ্জাইটিস প্রভৃতি সাঙ্ঘাতিক রোগও ঘটিয়ে থাকে। গবেষণা-গারে ডাঃ ফ্লেমিং এক ধরণের ঢাকা কাঁচের রেকাবিতে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যার নাম পেট্রিডিস, তাতে জীবাণু নিয়ে চর্চা ও গবেষণা চালাচ্ছিলেন। এই জীবাণুগুলির বিভিন্ন শ্রেণীকে তিনি

বিশেষ পর্যবেক্ষণ করে দেখছিলেন তাদের ওপরকার তাপমাত্রা ও তাদের খাদ্যের ধারা বদলে দিলে কেমন পরিবর্তন ঘটে, কিম্বা তারা কম অক্সিজেন পেলেই বা কী করে। তিনি এমন একটা উপায় বার করতে চেষ্টা করছিলেন যা ঐ উগ্র রোগ-জীবাণুগুলিকে নিস্তেজ ও দুর্বল করে দেয়,—যাতে তারা অন্তত মানুষ মারার উপযুক্ত হিংস্রতা হারায়। দিনে বারকয়েক করে তিনি গবেষণাগারে আসছিলেন আর একটা না একটা ডিস খুলে লক্ষ করছিলেন ঐ জীবাণুগুলির বিপর্যয়-বৈচিত্র্য।

বায়ুতে সব সময়ই ত ধূলিকণা রয়েছে, আরো কত জানা-অজানা পদার্থ রয়েছে তার ঠিক কী! যখনই কোন বৈজ্ঞানিক তাঁর পরীক্ষণীয় পদার্থে পরিবর্তন লক্ষ করার জন্যে রক্ষিত ডিসের ঢাকা খুলে দেখেন বাইরের কোন সূক্ষ্ম অদৃশ্য পদার্থ—সজীব বা নির্জীব, ডিসে এসে জমার দরুণ গবেষণার জন্য প্রস্তুত পরীক্ষা-ডিসটা ঐ পদার্থটা পড়ায় নষ্ট হয়ে গেছে তখন তিনি সে প্লেটটা ধুয়ে ফেলেন, সেটার পরিশুদ্ধি করেন ও আবার নূতন করে গবেষণা শুরু করেন।

একদিন এইভাবে ডাঃ ফ্লেমিংএর গবেষণা-পাত্রে বাইরের বায়ু থেকে কী একটা এসে জমল। ডাঃ ফ্লেমিং তাঁর গবেষণার বস্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে করতে সেটা লক্ষ করলেন। দেখলেন জীবাণুটির ওপর একটি ছোট্ট সবুজ ছাতা গজাচ্ছে।

প্রথমে এই পদার্থটা দেখে ডাঃ ফ্লেমিং-এর একটু বিরক্তির ভাব এল। তিনি আপন মনে বলে উঠলেন—

এই দেখ, কোথা থেকে এক উড়ো আপদ এসে হাজির হল। ওটা ওখানকার কোন জিনিসই নয়। অনর্থক এসে আমার

গবেষণার মধ্যে পড়ে জিনিসটাই মাটি করল। আবার এখন আমাকে নতুনভাবে কাজ শুরু করতে হবে!

ডাঃ ফ্লেমিং-এর পরের কাজই হল ডিসখানা পরিষ্কার করা, আর তাই করতে সেটা তিনি হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু ডাঃ ফ্লেমিং যে জীবাণু সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানান্বেষী; তাই তাঁর মনে কোন সন্দেহ, কোন জিজ্ঞাসা এলেই তা বেশ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ করেন।

ডাঃ ফ্লেমিং ডিসখানা ধুলেন না, নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। তুলে নিলেন অনুবীক্ষণ যন্ত্র, আবার দেখতে লাগলেন জিনিসটাকে ভালভাবে যন্ত্রের ভেতর দিয়ে।

এটা [illegible] লক্ষণীয় ব্যাপার নয়—ডাঃ ফ্লেমিং বলে উঠলেন। এখানে এমন একটা কাণ্ড ঘটতে দেখা যাচ্ছে যা সত্যিই বড় মজার।

ঠিক সেই মুহূর্তে বোধহয় ডাঃ ফ্লেমিং মনুষ্য-জীবনের আয়ুকে করায়ত্ত করতে সমর্থ হলেন!

সেই তুচ্ছ জিনিস,—সেই ছত্রক সম্বন্ধে তিনি গবেষণায় মন দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর তখনকার সেই মনোযোগ দেওয়াটা যে ভবিষ্যতের কত সম্ভাবনাপূর্ণ তা তিনি বোধহয় তখন উপলব্ধি করেননি। তখনো তিনি বুঝে উঠতে পারেননি একদিন এর থেকেই এমন একটা জিনিস তিনি তৈরি করে ফেলবেন যা শত-সহস্র রোগগ্রস্ত মানুষের পক্ষে হবে ধন্বন্তরি। ডাঃ ফ্লেমিং অতশত ভাবেননি বটে, তবে তিনি তখনকার গবেষণায় অনুবীক্ষণের ভেতর দিয়ে লক্ষ করলেন ঐ সবুজ ছত্রকটির ঠিক চারিপাশে একটা বৃত্তাকার স্বচ্ছ তরল পদার্থ রয়েছে, আর তার সংস্রবে মারাত্মক 'স্টাফ' জীবাণুগুলি কেমন যেন বিকৃত ও নির্জীব হয়ে গেছে। মনে হয় ঐ ছত্রকটি থেকে এমন একটা পদার্থ নিঃসৃত হয়েছে যা অবলীলাক্রমে জীবাণুগুলির মৃত্যু ঘটিয়েছে।

ডাঃ ফ্লেমিং বৈজ্ঞানিক, আর খুব ভাল বৈজ্ঞানিকই তিনি, তাই এই ঘটনা থেকেই অমনি হঠাৎ কিছু একটা সিদ্ধান্ত করে বসলেন না। শুধু তিনি মনে মনে এইটুকু বুঝলেন যে, এই সবুজ ছত্রকটি যে জাতীয় পদার্থে জন্মেছে তাতে বেশ ভাল একটা জীবাণু-ধ্বংসী পদার্থ রয়েছে।

তিনি স্থির করলেন আরো একটু ভাল অনুকূল অবস্থায় এই ছত্রক গজাতে হবে, যাতে ওটার ওপর বেশ ভাল রকম পরীক্ষা চালানো যায়। তাই তিনি এক ডিস পেপটোন ক্বাথ তৈরি করলেন যাতে সহজেই ছত্রক গজাতে পারে। তারপর একটা সূক্ষ্ম যন্ত্র নিয়ে তাই দিয়ে ঐ সবুজ ছত্রকের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ তুলে নিলেন। তারপর সেটা এই ক্বাথের ওপর ছেড়ে দিলেন। দিয়েই তাড়াতাড়ি একটা গরমজলে পরিশুদ্ধ-করা কাচের ঢাকনা দিয়ে ডিসটা ঢেকে দিলেন, যাতে বাইরের বায়ুমণ্ডলের ধূলা জীবাণু বা অন্যপ্রকারের ছত্রকের বীজ ভেতরে না ঢুকতে পারে। তারপর কী হয় দেখবার জন্যে কিছুদিন অপেক্ষা করে করে লক্ষ করতে লাগলেন।

পর পর কয়দিন কাটল, ছত্রকও বাড়ছে। ডাঃ ফ্লেমিং দেখলেন, ছত্রক থেকে নতুন যে সব অংশ বিস্তার করছে সেগুলি প্রথমে সাদা, পরে তাই আবার সবুজ হয়ে গেল, ক্রমে একটা পাতলা চটের মত ঘন জমাট চাপ হয়ে উঠল। ডাঃ ফ্লেমিং আরো দেখলেন ছত্রক থেকে বিন্দু বিন্দু সোনালি একটি তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়ে যে ক্বাথের ওপর এটা শিকড় গেড়েছিল তার মধ্যে পড়ছে। এই সোনালি তরল পদার্থটাই আসল, এটাই ত আগে সেই পেট্রি ডিসে জীবাণুগুলিকে মেরে ফেলেছিল।

ডাঃ ফ্লেমিং নিজে ছত্রক-বিজ্ঞান-বিশারদ ছিলেন না, তিনি

এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার জন্যে অধ্যয়নও করেন নি। তাই তিনি শুধু তাঁর নোটে এই ছত্রক সম্বন্ধে মন্তব্য লিখলেন—এটা পেনিসিলিয়াম জাতীয় একটা ছত্রক। কিন্তু তার বিশেষ কোন্ শ্রেণীতে যে এটা পড়ে তা তাঁর সঠিক জানা ছিল না।

পেনিসিলিয়াম এক রকমের মৃত্তিকা-উদ্ভূত ছত্রক, কিন্তু এ জাতের ছত্রক বিরল বলা যায়। এরই দু-একটা জাত পনিরে বা রুটিতে জন্মায়, যদিও ওখানটা তাদের ঠিক স্বাভাবিক জন্মস্থান নয়। চেহারায় এটা শুঁয়োপোকা, লোমশ এবং অণুবীক্ষণ দিয়ে লক্ষ করলে দেখা যায় ক্ষুদে ক্ষুদে কত শাখাপ্রশাখা রয়েছে, কাজেই একে অনেকটা বেশ ছোটখাটো ঘন বুরুশের মত দেখায়। এই রকম চেহারার জন্যেই আগে একজন বৈজ্ঞানিক এর 'পেনি-সিলিয়াম' নামকরণ করে গেছেন, কেননা ল্যাটিন 'পেনিসিলিয়াম' শব্দটার অর্থই হচ্ছে বুরুশ।

ডাঃ ফ্লেমিং এইভাবে ছত্রকের চাষ করে করে যখন দেখলেন —হ্যাঁ, এবার এর ওপর গবেষণা করা যায়, তখন প্রথম পরীক্ষা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য হল ছত্রকের কাইটা কিভাবে জীবাণু নাশ করে সেটা দেখা। তিনি খানিকটা ঐ কাই নিয়ে আগে তা থেকে পরিস্রুত (ফিল্টার) করে নিলেন। তারপর তাঁর জীবাণু চড়ার ডিসগুলির একটার ঢাকা খুললেন। দেখেন—হ্যাঁ, জীবাণুতে ডিসটা ভর্তি হয়ে একেবারে গিজগিজ করছে! এইবার পরীক্ষা করবার মত ঠিক অবস্থায় এসেছে। তারপর ঐ জীবাণুগুলির মধ্যে খানিকটা পরিস্রুত কাই তিনি ছেড়ে দিলেন।

ঐকান্তিক উন্মুখ আগ্রহে ডাঃ ফ্লেমিং লক্ষ করতে লাগলেন কী হয় না হয়। কাইটা ছাড়া-মাত্র দেখলেন ডিসের মধ্যে একটা যেন লড়াই শুরু হয়ে গেল। পেনিসিলিয়াম-ছত্রক-নির্যাসের ভেতর

একটা এমন দ্রব্যগুণযুক্ত পদার্থ ছিল যা জীবাণুদের মেরে ফেলছে দেখা গেল। খানিকক্ষণের মধ্যে—বাস, সব ঠাণ্ডা। জীবাণুগুলি মরে উজাড় হয়ে গেল!

এ ব্যাপারটা দেখেও কিন্তু ফ্লেমিং বুঝলেন এত সহজে কাজ উদ্ধার হয়নি। কেননা নির্যাসটা ডিসের জীবাণুগুলির ক্ষয় করল বলেই যে ঐ দিয়ে মনুষ্য-শরীরের ব্যাধি ভাল করা যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এরকম ভাবা মানে যুক্তি ডিঙিয়ে সিদ্ধান্তে পৌছনো বা অনুমান-প্রমাণ ব্যতিরেকেই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার মত। তবে তিনি বুঝলেন নির্যাসটার গুরুত্ব বেশ যথেষ্ট।

তিনি তাঁর গবেষণাগারের সহকারী দু-জনকে ঐ নির্যাসটার কথা বললেন ও তাদের আরো খানিক পরীক্ষা করতে লাগিয়ে দিলেন।

এখন এই যে তাঁর সহ-বিজ্ঞানীরা আবার একটি পরীক্ষায় নামবেন এতে প্রথমে দরকার ছিল অনেক পরিমাণে পেনিসিলিয়াম-ছত্রক জন্মিয়ে নেওয়া, যাতে সেই নির্যাসটাও বেশি পরিমাণ ব্যবহার করতে পারেন। ডাঃ ফ্লেমিং ও তাঁর সহকারীরা ব্যাকটিরিয়া-প্লেট খুলে ধরে বায়ু থেকে এই ছত্রকের সূক্ষ্ম বীজ ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্লেটে একটাও এল না। সুতরাং তাঁরা বুঝলেন এ ধরণের ছত্রকগুলি বড়ই দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর। তাই তাঁদের মনে হল এই যে প্রথম ছত্রকটা তাঁরা পেয়েছেন এটা যেন ভেল্কি, এটা যেন দৈবাৎ জীবাণু-জিঘাংসু বৈজ্ঞানিকের পেট্রি-ডিসে জীবাণু-নাশক ওষধিরূপেই আবির্ভূত হয়েছিল, নচেৎ এ জিনিসের দেখা বড় একটা ত মেলে না।

যাহোক সেই ক্ষুদ্র ছত্রকটাকেই তাঁরা তখন তুলভ জ্ঞানে বিশেষ যত্নে রক্ষণ ও বর্ধন করতে লাগলেন। ডাঃ ফ্লেমিং ওর থেকে আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র অংশ বীজরূপে তুলে নিয়ে ক্কাথ-যুক্ত
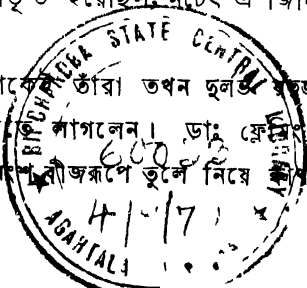
রেকাবিতে রাখলেন। সেগুলি আবার ধীরে ধীরে গজানোয় তাঁদের ছত্রকের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে উঠল ও তাঁদের কাচের ডিসে ডিসে সাজানো বুরুশ-সদৃশ ছত্রকের একখানা বাগান-বিশেষ যেন শোভা পেতে লাগল।

তারপর যা কাজের কথা সেই আসল পরীক্ষায় এগোলেন ডাঃ ফ্লেমিং। মনুষ্য-রক্তে পেনিসিলিন নির্যাসের কী রকম প্রভাব হয়, তা ক্ষতি করে কি না করে, তার পরীক্ষা করলেন। তিনি ভাবছিলেন এখনকার দিনের প্রচলিত বিষ-প্রতিরোধক ওষুধগুলির মত পেনিসিলিন নির্যাসও শ্বেত রক্তকণিকার ক্ষতি করবে হয়ত। [illegible] থেকে তিনি দু-এক বিন্দু রক্ত নিলেন। তার ওপর পেনিসিলিন নির্যাস ফোঁটা ফোঁটা করে ফেললেন। ফলাফলটা লক্ষ করতে লাগলেন অনেকক্ষণ লাগিয়ে। শেষে দেখে অবাক হয়ে গেলেন, এ নতুন ওষুধটি রক্তের শ্বেত বা লোহিত কোন কণিকারই ক্ষতি করল না।

তাহলেও এই ওষুধের আরো অনেক তথ্য তখনো তার জ্ঞাতব্য ছিল। সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা চাই, নইলে কি কাজ চালানো যায়? এর পরে তার জানবার বিষয় হল—ঐ ছত্রক-নির্যাস জীবন্ত মনুষ্য-শরীরে চিকিৎসার্থ প্রয়োগ করলে তা কোন রকম ক্ষতি করে কিনা। এই জানতে তিনি এক খরগোস ধরে তার শিরায় ঐ নির্যাস ইনজেকশান করে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। ফল লক্ষ করতে থাকলে দেখা গেল, খরগোসটির ভিতর কোন রকম স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব দেখা যাচ্ছে না। চমৎকার সুস্থ আছে সেটি। কাজেই এখানেই তিনি এই প্রথম প্রমাণ পেলেন, ছত্রকের রস রক্তে বিরূপ প্রতিক্রিয়াকারী নয়। প্রাণীর রক্তকণিকা বা বিধানতন্তু কিছুরই এ ক্ষতি করে না।

আশা বেড়ে উঠল ডাঃ ফ্লেমিংএর। মনে পড়ল তাঁর সেই দশ বছর আগেকার কথা। সেই ফ্রান্সের সামরিক হাসপাতালে তাঁর দুষ্টিপ্রতিষেধক ওষুধের অনুসন্ধান। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই দশবছর যে সমস্যা নিয়ে তিনি মাথা ঘামিয়ে এসেছেন আজ এই ছত্রক-নির্যাসে কি তবে তার সত্য সমাধান মিলল?

কই, তাও ত ডাঃ ফ্লেমিং ঠিক মানতে পারছেন না, যাবত না নানা ভাবে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে একটা ধ্রুব সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছেন।

যাহোক তিনি তখনো গবেষণা চালিয়ে চললেন। ঐ নির্যাস থেকে ওর ভেতরকার ওষুধ অংশটি বার করে নিয়ে, তাকে আরো পরিশুদ্ধ করে নানাভাবে এর গুণাগুণ আরো জেনে এর বিবিধ ক্রিয়া ও ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে এই বৈজ্ঞানিক মনীষী এক জীবন-ত্রাতা ভেষজ আবিষ্কারে নিরত রইলেন।

প্রচণ্ড উৎসাহ

বৈজ্ঞানিকের জীবন কখনো বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে নয়, অদ্ভুত নানা আকর্ষণে ভরা। ডাঃ ফ্লেমিংএর জীবনও ছিল তাই।

ছেলেপুলেদের খেলায় যে বিপুল উৎসাহ বা সংকল্পের দৃঢ়তা দেখা যায় সেই জিনিসগুলিই তাদের খেলায় জয়লাভে সহায়তা করে। বালক বয়সে ডাঃ ফ্লেমিং এক উৎসাহী রাগবি খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর সে সকল ঝোঁক, সে সমস্ত উৎসাহ, তাঁর শিক্ষিত কুশলী মনের সে সমস্ত বুদ্ধি এখন পূর্ণবয়স্ক মানুষটিকে এক অভিনব খেলায় নিয়োজিত করল। এ খেলা বৈজ্ঞানিকের খেলা, এ খেলায়

এমন কিছু একটি জিনিস খুঁজে বার করতে হবে যা মানব-জাতির বিশেষ উপকারে আসে। এক বছর এভাবে গবেষণা করার পর তিনি মনে করলেন—পেনিসিলিয়াম-নির্যাসের ঔষধাংশের গুণাগুণ তিনি পর্যাপ্ত জানতে পেরেছেন। তাই তিনি তাঁর লব্ধ জ্ঞানের বিবরণ একটা চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশ করলেন।

এটা প্রকাশ করার মধ্যে ডাঃ ফ্লেমিং-এর একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি স্থির করেছিলেন তার এই ওষুধ মানুষের প্রয়োজনে কাজে লাগাবার আগে এর সমস্ত রকম জটিল তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা চাই। আর ওষুধটা যদি তাঁর ধারণানুযায়ী কাজের হয় তাহলে [illegible] সম্ভব এটাকে চালু করা দরকার। তাই তিনি এই আশায় তাঁর প্রবন্ধটা প্রকাশ করলেন যে, অন্য বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকেরা এটা পড়বে এবং তারাও পেনিসিলিন সম্বন্ধে গবেষণায় লেগে যাবে। তখন হয়ত অমন আরো দু-দশটা বিজ্ঞ মাথা এই বিষয় নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে থাকবে, আর তাদের ভাল ভাল ল্যাবরেটরির সহায়তায় তারা ওষুধটির দ্রুত উন্নতি করে এটাকে বেশ নির্ভরযোগ্য ওষুধ করে তুলবে।

সুতরাং তিনি পেনিসিলিন সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কার ও গবেষণার বিষয় বেশ বিশদভাবে লিখলেন এবং লিখে British Journal of Experimental Pathologyতে ছাপবার জন্য পাঠালেন। ১৯২৯ সালে এটা প্রকাশিত হল। বহু ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক এটা পড়লেন এবং তাঁদের মধ্যে একটা আগ্রহের সৃষ্টি হল। কিন্তু অতি শীঘ্রই সে উৎসাহ আগ্রহ আবার নিভে গেল। তার দুটো কারণ ছিল বলা যায়। প্রথমত এই পেনিসিলিয়াম ওষুধ দিয়ে যে ধরণের চিকিৎসা হওয়া সম্ভব তাকে Chemotherapy বলে। তখন পর্যন্ত Sulfa drugগুলি বার হয়নি, কাজেই

Chemotherapy শ্রেণীর চিকিৎসার ধারণা ডাক্তারদের তেমন ছিলনা। দ্বিতীয়ত ছত্রক থেকে জীবাণুধ্বংসী যে নির্যাস পাওয়া যেত তার পরিমাণ এত অল্প, তা দিয়ে একটা রোগীর পূর্ণ চিকিৎসা করা সম্ভব নয়।

তখনকার দিনে একটা রোগীর চিকিৎসার উপযুক্ত পেনি-সিলিন নির্যাস ক্ষরণ করার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ ছত্রক জন্মানো একপ্রকার অসম্ভব ছিল। একটা রোগীরই যেখানে চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছেনা সেখানে সারা জগতের হাসপাতালে হাজার হাজার রোগীর চিকিৎসার জন্যে পেনিসিলিযাম নির্যাস কোথায় পাওয়া যাবে! কাজেই যাঁরা ডাঃ ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিয়াম থেকে ওষুধ বার করার বিবরণ পড়লেন তাদের মনে হল এটা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অতি দুরূহ, চাইকি অসম্ভব! কাজেই এ নিযে স্বল্প পরিমাণ আলোচনা-গুঞ্জন উত্থিত হযেই তা শূন্যে মিলিয়ে গেল, পেনিসিলিযাম নিযে আরো পরীক্ষা করার কথা ধামাচাপা পড়ে গেল। এইভাবে ডাঃ ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেও এবং তার মনুষ্য-জীবন রক্ষার ক্ষমতার কথা সুবিদিত হলেও তারপরে এগার বছর এই পেনিসিলিন নিয়ে কেউ কোন গবেষণা ত দূরের কথা, উচ্চ-বাচ্যও করেনি, শুধু তিনি নিজে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে যা গবেষণা চালিযে গেছেন।

এখন একটা সমস্যা হল এই সূক্ষ্ম পেনিসিলিযাম-ছত্রক কিভাবে বেশি পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়। দ্বিতীয়ত তা থেকে আবার জীবাণুধ্বংসী ভেষজ-নির্যাস বেশি পরিমাণে নিঃসারিত করানো যায় কী করে!

ডাঃ ফ্লেমিং নানা রকমের ক্বাথ ব্যবহার করলেন এই ছত্রক জন্মানোর জন্যে, আর তিনি এটার উৎপত্তি-বৃদ্ধির অনুকূল

রাসায়নিক পদার্থও পাঁচটা বানালেন। কিন্তু তাও অতি অল্প পরিমাণেই জন্মাতে লাগল।' তিনি কাই থেকে ওষুধ-ভাগটা পৃথক করে নেবার চেষ্টা করলেন ও তা একরকম বাদামি রঙের গুঁড়ো পদার্থের আকারে বার করেও নিলেন। তবু এটাই কিন্তু বিশুদ্ধ পেনিসিলিন হল না। কিন্তু কী করবেন, এর থেকে উন্নতিতে নিয়ে যাওয়ার মত বৈজ্ঞানিক উপকরণ ও সরঞ্জাম ডাঃ ফ্লেমিং-এর ছিল না।

এই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ডাঃ ফ্লেমিং যতটুকু পেনিসিলিন ওষুধ সংগ্রহ করেছিলেন তা অনেক প্রকারের জীবাণুর (ব্যাক্টিরিয়া) ওপর এবং প্রাণী জগতে যত প্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরজীবি জীবাণু (প্যারাসাইটস) থাকতে পারে, তার অনেকগুলির ওপরও পরীক্ষা করলেন। তিনি দেখলেন এ ওষুধ ব্যাক্টিরিয়া শ্রেণীর জীবাণুর ওপর কাজ করে বটে কিন্তু প্যারাসাইটগুলির ওপর কাজ করে না! তা সত্ত্বেও ওষুধটার যে একটা অবধারিত শক্তি আছে এসম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় হলেন।

তিনি দেখলেন পেনিসিলিন রোগ-জীবাণুগুলিকে ঠিক মেরে ফেলে না বটে কিন্তু তাদের দুর্বল করে দেয়, যাতে তারা আর সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে না পারে, বা শরীরের মধ্যে তেমন ক্ষযাত্মক ক্রিয়া করতে না পারে। পেনিসিলিন জীবাণুগুলিকে এই অবস্থায় এনে ফেললেই খানিক কাজ হয়, কেননা তখন রোগীর দেহের শ্বেত রক্তকণিকাগুলিই সুযোগ পেয়ে ঐ দুর্বল জীবাণুগুলিকে জয় করে ফেলে, ফলে রোগ সেরে যায়।

ডাঃ হ্যারল্ড রেস্ট্রিক নামে ডাঃ ফ্লেমিং-এর এক বন্ধু তাঁর গবেষণায় আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ডাঃ ফ্লেমিং-এর অনুরোধে ডাঃ রেস্ট্রিক

তাঁর কাছ থেকে খানিকটা ছত্রকের ক্ষুদ্রঅংশ নিজের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে সেটাকে বর্ধন করতে লাগলেন, তার ওপর নিজে নানারকম গবেষণাও করতে লাগলেন।

কারো বিশেষ আগ্রহ নেই

কালক্রমে ডাঃ ফ্লেমিং ও রেস্ট্রিক টেস্ট-টিউবে এবং জন্তুর দেহে পেনিসিলিনের অনেক প্রকার পরীক্ষা সমাপ্ত করলেন, ফলে এ জিনিসটার প্রধান গুণাগুণ তাঁদের অনেক জানা হয়ে গেল। তাঁরা জানলেন বিধানতন্তু ও রক্তের ওপর এর ক্রিয়া খুব মৃদু এবং ক্ষতিকর-জীবাণুদের বৃদ্ধি বন্ধ করে। এবার তাঁরা বুঝলেন পীড়িত মনুষ্য-শরীরে এ ওষুধ প্রয়োগ করে দেখা দরকার। এরূপ পরীক্ষার উপযোগী ছত্রক-নির্যাস তাঁরা এতদিনে সংগ্রহ করেছেন এ বিশ্বাস তাঁদের ছিল। তখন ডাঃ ফ্লেমিং কতিপয় প্রখ্যাত ডাক্তারের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে প্রস্তাব করলেন। কিন্তু আশ্চর্য, ডাক্তাররা তাঁর প্রস্তাবে সন্দেহ এবং ঔদাসীন্যই প্রকাশ করলেন। ডাঃ ফ্লেমিং ও ডাঃ রেস্ট্রিক বারবার তাঁদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলেন এবং আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে চাইলেন, কিন্তু সকলই নিরর্থক হল।

১৯৩২ সালে কয়েকজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষক পেনিসিলিন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত গবেষণা করার পর খানিকটা পেনিসিলিয়াম-ছত্রক আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সরকারি কৃষি-বিভাগের ছত্রক বিশেষজ্ঞ ডাঃ চার্লস টম-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি এটা পরীক্ষা করে যথাযথ বলে দিতে পারলেন, এটা ঠিক কোন্ শ্রেণীর

পেনিসিলিয়াম-ছত্রকের অন্তর্গত। তিনি বললেন, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এর নাম হল পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম নোটেটাম।

এদিকে ডাঃ ফ্লেমিং এই নতুন ওষুধ সম্বন্ধে তাঁর অধ্যয়ন ও গবেষণার বিস্তৃত ফলাফল লিপিবদ্ধ করে আর একটা প্রবন্ধ লিখলেন এবং সেটা ব্যাক্টিরিওলজিস্টদের একটা সভায় পাঠিয়ে দিলেন। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, তাঁরা সে প্রবন্ধটা একবার খুলে দেখলেনও না।

ডাঃ ফ্লেমিং-এর এতে নিশ্চয় নিরুৎসাহ হয়ে যাবার কথা। তবে তিনি তাঁর পেনিসিলিন সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হলেন না, হলেন ডাক্তারদের ভাবগুলি লক্ষ করে। পেনিসিলিনের ক্রিয়াশক্তির ওপর তাঁর আস্থা কিন্তু বিন্দুমাত্রও টলল না। দুষ্প্রাপ্য সেই ছত্রকের চাষ ও চর্চা তিনি তখনো তাঁর গবেষণাগারে অব্যাহত রাখলেন এবং ঐ নিয়ে তিনি বছরের পর বছর ধরে একাকীই গবেষণা করে চললেন।

১৯৩৫ সালে Sulfa drugs প্রথম চিকিৎসকদের পরিচয়ে এল। কতকগুলি মারাত্মক সংক্রামক রোগে এর আরোগ্য-ক্ষমতা অত্যাশ্চর্য দেখা গেল। সারা জগত Sulfa drugs এর কথা জেনে গেল আর এ ওষুধটা পেয়ে ধন্য হল। এই নতুন ওষুধটা তখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও ডাক্তারদের পেনিসিলিনের থেকে বেশি আকর্ষণীয় হল। তাহলেও এ ওষুধগুলিই কিন্তু একদিক দিয়ে আবার পেনিসিলিনের স্বীকৃতির পথ প্রস্তুত করে দিল। আগে ডাক্তারদের ধারণা ছিল শোণিত-প্রবাহের মধ্যে কোন রাসায়নিক দ্রব সঞ্চার করে জীবাণু মারা সম্ভব নয়। এই Sulfa ওষুধগুলি সে ধারণা ভেঙে দিল। এগুলির ক্রিয়া থেকে এই কথাই সপ্রমাণিত হল যে, এমন কোন কম প্রতিক্রিয়াকর মৃদু রাসায়নিক পদার্থ

থাকতে পারে, যা দেহের অভ্যন্তরে সঞ্চারিত হলে বিধানতন্তু ও রক্ত-কণিকার ক্ষতি না করেও রক্তস্রোতের মধ্যে জীবাণুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। তাঁরা ভাবলেন Sulfa drugsএর ভিতর যদি উক্তপ্রকার গুণযুক্ত একটা পদার্থ পাওয়া গিয়ে থাকে ত আর কোন কিছুর ভিতর যে অনুরূপ আর একটা পদার্থ পাওয়া যাবেনা তার কী মানে আছে! তাই অনেক বৈজ্ঞানিক এই ধরণের চিন্তা অবলম্বনে মাথা ঘামাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে জার্মানিতে হল হিটলারের অভ্যুত্থান। তার বিবিধ ফ্যাসিস্ট নীতি জার্মানির জনগণকে ত প্রভাবিত করলই, তাইকি সারা ইউরোপে একটা ব্যাধির মত সংক্রামিত হল। নাৎসি সর্বাত্মকবাদের বিষসংক্রমণ, জাতিগত বিদ্বেষ, নানাপ্রকারের নৃশংস নিষ্ঠুরতা, ক্ষমতালিপ্সা—এসবের প্রাদুর্ভাবে জগদ্বাসী শঙ্কিত হয়ে উঠিল। তাই অন্যান্য কয়েকটি জাতি এর উচ্ছেদের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করল। আর এই কারণেই বেজে উঠল জগদ্ব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণডঙ্কা।

১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড যুদ্ধে যোগদান করল ও প্রাণপণ চেষ্টায় রণসাজে সজ্জিত হতে লাগল। কয়েকমাস পরে দেখা গেল জার্মানরা বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স আক্রমণ করেছে, আর ইংরাজদের যেতে হল তাদের রুখতে। যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষেরও বহু লোক আহত হচ্ছিল আর তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল ইংলণ্ডের হাসপাতালগুলিতে। এই আঘাত ও ক্ষতির আধিক্যে ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকদের ক্ষত-দুষ্টি রোধ করার উপযুক্ত উপায় খুঁজতে হচ্ছিল; তা নইলে সৈন্যদের জীবন বাঁচানো যায় কী করে?

ইতিমধ্যেই Sulfa drugs এর ব্যবহার প্রচলন হয়েছিল এবং

চমৎকার কাজ দিলেও কতকগুলি অবস্থায় এরা অকেজো প্রমাণিত হচ্ছিল। তাছাড়া বিশেষ কতকগুলি ব্যাধি ছিল যা আরোগ্য করবার ক্ষমতা এদের ছিলনা। তাঁরা এমন একটা জিনিস খুঁজছিলেন যা বিধানতন্ত্রর পক্ষে ক্ষতিকর হবেনা এবং কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না।

এত বড় একটা প্রয়োজনের দাবি মেটাতে বিজ্ঞান কী আবিষ্কার করবে, কোন অবদান দেবে সে? প্রত্যেক আহতলোক যার সারবার সম্ভাবনা আছে তাকে ত সারাতেই হবে। নগরের ওপর বোমা-বর্ষণে আহত নরনারী ও শিশুদের অবশ্যই আজ হোক কাল হোক বা ভবিষ্যতেই হোক বাঁচাবার সুযোগ করে দিতে হবে। সকল বৈজ্ঞানিকের চিন্তা ধাবিত হল এই প্রয়োজন মেটাবার উপায় বার করতে। যত রকম উপায় সম্ভব হতে পারে সবগুলির কথাই তন্ন তন্ন করে বিবেচনা করা হল; তার মধ্যে পেনিসিলিনের প্রসঙ্গও অন্যতম উপায় রূপে আলোচিত হল।

পরিশেষে দেখা গেল ডাঃ ফ্লেমিং-এর মনস্কামনাই পূর্ণ হতে চলল। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা ঐকান্তিক আগ্রহে পেনিসিলিন সম্পর্কে গবেষণা করতে লাগলেন এবং পেনিসিলিন যে মনুষ্যজাতির প্রকৃতই উপকারে লাগবে তার আশাও সুস্পষ্টভাবে দেখা যেতে লাগল।

কেউ না কেউ কাজ চালিয়ে যায়

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন চমৎকার ধীমান তরুণ ছিলেন। তিনি ডাঃ ফ্লেমিং-এর গবেষণা ও আবিষ্কারে আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিলেন! তাঁর নাম ডাঃ হাওয়ার্ড ওয়াল্টার ফ্লোরি। অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম, অক্সফোর্ডের প্যাথোলজির অধ্যাপক।

তাঁর গবেষণাগারে তাঁর নির্দেশানুযায়ী কাজ করেছিলেন এমন নানা দেশের অনেক বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ডাঃ হাওয়াড ফ্লোরির সারা জীবনই একরকম চিকিৎসক-সান্নিধ্যে কেটেছে বলা যায়। এমন কি বিবাহও করেছিলেন তিনি এক মহিলা চিকিৎসককে, তাঁর নাম ডাঃ মেরী ফ্লোরি—তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাতেন।

১৯৪০ সালে ইংরাজ সৈন্যরা ইউরোপের মূল-স্থলভাগে জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। সেখানে আহত সৈনিকদের এনে হাসপাতালে বোঝাই করা হচ্ছিল। ডাঃ ফ্লোরি তাঁর গবেষণাগারে মানুষের জীবন বাঁচাবার উপায় অনুসন্ধান করে নানারকম পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। চালাতে চালাতে তাঁর খেয়াল গেল পেনিসিলিনের দিকে, তিনি স্থির করলেন ডাঃ ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিন-তত্ত্ব অধ্যয়ন করবেন এবং তা নিয়ে খানিক গবেষণা করে দেখবেন।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। তিনি তাঁর বিভাগেই কর্মরত, আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ডাঃ লেসলি ফককে ডাক দিলেন, তার সঙ্গে ডাকলেন রুশ বৈজ্ঞানিক ডাঃ আর্নেস্ট চেইনকে, তাঁদের নির্দেশ দিলেন—ওহে, পেনিসিলিন নিয়ে আমার সঙ্গে

কাজ করবে চল দেখি। তারপর তাঁরা ডাঃ ফ্লেমিং-এর সঙ্গে চিঠিপত্রে সংযোগ স্থাপন করলেন, এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চললেন সেণ্টমেরীতে।

ডাঃ ফ্লেমিং-এর চুলে এতদিনে পাক ধরেছে, দৃষ্টি হয়েছে গম্ভীর। সেই বিদগ্ধ মনীষী এসে আন্তরিক আগ্রহের সঙ্গে এঁদের অভ্যর্থনা করলেন। এঁরা চিঠিতে যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন ঠিক তার খেই ধরে ডাঃ ফ্লেমিং কথাবার্তা শুরু করলেন।

আপনারা পেনিসিলিন নিয়ে গবেষণায় এগোচ্ছেন জেনে আমি বড়ই খুশি হয়েছি—বললেন ডাঃ ফ্লেমিং।

সত্যি, আমরা এতদিন ধরে এ জিনিসটাকে উপেক্ষা করে আসছিলাম—উত্তর দিলেন ডাঃ ফ্লোরি।

অবশ্য আপনার এই ছাতাটা থেকে বড়দরের কিছু করে ফেলা মুস্কিল, তবু যাই হোক, আমরা চেষ্টা করব।

ডাঃ ফ্লেমিং স্মিত হাস্য করলেন। যা শুনলেন তাতে এই বহু বৎসর ধরে একলাটি পরিশ্রম করে যাওয়ার পর সান্ত্বনা ও শান্তিদায়ক কিছু মিলল বটে। তিনি বললেন—

আমার সঙ্গে একটু ল্যাবরেটরিতে আসবেন? আমি সেখানে যে ছাতার চাষ করছি তা দেখলে খুশি হবেন বলে মনে হয়। আমার কিছু কিছু পরীক্ষাও সেখানে চলছে, তাও দেখতে পাবেন।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।—বলে উঠলেন ডাঃ ফ্লোরি। তখন তিনি ও তাঁর সহ-বৈজ্ঞানিকেরা ডাঃ ফ্লেমিংকে অনুসরণ করে পাশের ঘরে গেলেন।

সেখানে এক পুরনো কায়দার ল্যাবরেটরি। তার কালো আঁধার দেওয়ালগুলির বেষ্টনে সামান্য কতকগুলি সাজ-সরঞ্জাম। ডাঃ ফ্লোরি দেখলেন সেখানে এক অতি ক্ষুদ্র সবুজ ছত্রক তার

শাখা-পত্র বিস্তার করে বিরাজ করছে। একদিন যা লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরাময়ের কারণ হবে।

তাঁরা দেখলেন ছাতাটা কিন্তু দেখতে একটা খুব সাধারণ ছাতার মত। হাঁ, ঠিক সেই রকমই—পাতলা সবুজ ও সাদা অংশ বিস্তার করে বিভিন্ন কাচের বোতলে ক্বাথের ওপরে জেগে রয়েছে।

তারপর ডাঃ ফ্লেমিং যে পরিমাণ ওষুধ ছত্রক থেকে নিঃসৃত হয়ে তার উৎপত্তিস্থান স্থানের ওপর পড়েছিল ও তা পৃথক করে উদ্ধার করেছিলেন সেটা তাঁদের দেখালেন। খানিকটা বাদামি রঙের গুঁড়োর আকারে সেই ওষুধটাকে দেখা গেল। ডাঃ ফ্লেমিং তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন—ওষুধটা এখনও পরিশুদ্ধ করা হয়নি। এই চূর্ণ-ভেষজে অন্যান্য রসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ আছে ও বিশুদ্ধ ভেষজের ভাগ শতকরা খুব কমই আছে। কিন্তু পেনিসিলিন এমন শক্তিমান ও কার্যকরী যে এই অবিশুদ্ধ বাদামি গুঁড়ো পদার্থটাই রোগ-জীবাণু ধ্বংসে অলৌকিক কাজ দেখতে পারে। তারপর তিনি ঐ আগন্তুকদের তাঁর গবেষণা ও পরীক্ষার বিবরণ-লিপি দিলেন। পরিশেষে তিনি তাঁদের বললেন—

আমি আশা করি আপনারা পেনিসিলিনকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করতে পারবেন যখন এটা সমগ্র মানব-সমাজের প্রকৃত হিতকারীই হবে।

দেখি কাজ ত করে যাই। যতটুকু এগোব তক্ষুনি আপনাকে জানাব। সাগ্রহে উত্তর দিলেন ডাঃ ফ্লোরি।

বহুদিন আগে ডাঃ ফ্লেমিংএর জানালা দিয়ে তাঁর গবেষণা-পাত্রে যে ছত্রক একটা মসী-চিহ্নের মত আবির্ভূত হয়েছিল ও যেটাকে তিনি এতদিন সযত্নে বর্ধন করে নানা চর্চায় রত ছিলেন সেই দুর্মূল্য ছত্রকের অল্প কিছু অংশ তিনি ডাঃ ফ্লোরি ও তাঁর-সহচরদের

উপহার দিলেন। তারপর ডাঃ ফ্লোরি ও তাঁর দলবল ডাঃ ফ্লেমিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন এবং টেস্টটিউব ভর্তি সেই ছত্রকটি হাতে করে অক্সফোর্ডগামী ট্রেন ধরতে নিকটবর্তী স্টেশনের দিকে রওনা হলেন।

এইবার এই বিজ্ঞানীরা কাজে বসলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশে ডাঃ ফ্লোরি ব্রিটিশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল থেকে কিছু টাকা মঞ্জুর করিয়ে আনতে সমর্থ হলেন; যাতে তাঁর গবেষণার ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয়। 'রকফেলার ফাউণ্ডেশান নামক প্রতিষ্ঠান থেকেও কিছু অল্প পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করা হল এবং আশ্বাস পাওয়া গেল টাকার পরিমাণ ভবিষ্যতে আরো বাড়ানো হবে। এই বিরাট আমেরিকান প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই রোগ জীবাণু-নাশক ঔষধ সম্বন্ধে কিছু পরীক্ষা করছিল, কাজেই তার কর্মকর্তাদের পেনিসিলিন সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মানো ডাঃ ফ্লোরির পক্ষে বিশেষ কঠিন হল না।

তাছাড়া অক্সফোর্ড ল্যাবরেটরির সুসজ্জিত সরঞ্জাম-উপকরণের বিশেষ সুযোগ ডাঃ ফ্লোরির ছিল। এ কাজে তিনি সহকারীরূপে পেয়েছিলেন বুদ্ধিমান ও কর্মকুশলী ডাঃ চেইনকে; তাছাড়া প্রয়োজনমত আরো কুড়িজন সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক ও কর্মকুশলীকে কাজে লাগিয়ে দিলেন। এইবার এই ওষুধের উন্নতিকরণের জন্য যতগুলি বিভিন্ন বিজ্ঞান-বিশারদ দরকার সবাই একযোগে কাজ করতে লাগলেন; ব্যাক্‌টিরিওলজিস্ট্ (জীবাণুবিদ), প্যাথোলজিস্ট (ব্যাধি-বিজ্ঞানবিদ), কেমিস্ট (রসায়নবিদ), মাইকোলজিস্ট (ছত্রক-বিশারদ) ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা এক পেনিসিলিনের গবেষনায় উঠে পড়ে লাগলেন। এতগুলি লোকের পক্ষেও কাজটি সহজ ও অল্প সময়-সাধ্য বলে মনে হল না।

এত বৎসর ধরে কাজ করে ডাঃ ফ্লেমিং যতটুকু এগিয়েছিলেন তাতে তাঁর পেনিসিলিন তখনো টেস্ট-টিউব স্তরে অর্থাৎ পরীক্ষাধীন অবস্থায় ছিল বলা যায়। এর কারণ—তাঁকে অত্যল্প সাজ-সরঞ্জাম ও উপযুক্ত সাহায্যের অভাবের মধ্যেই কাজ করতে হচ্ছিল। আর হাস-পাতালের ডাক্তাদেরও এতে কোন সহযোগিতা ছিল না। সুতরাং ডাঃ ফ্লোরি ও তাঁর সহকারীদের তখনো পেনিসিলিন সম্পর্কে অনেক জটিল সমস্যা সমাধান করবার ছিল। প্রথমে তাঁরা এই ছত্রক-নির্যাস থেকে বিশুদ্ধতর ভেষজাংশটুকু বের করে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কেননা তাই হল যে আসল পেনিসিলিন।

এইটা বের করাই এত দুরূহ ছিল যে এতগুলি বৈজ্ঞানিক বৎসরাধিক কাল আপ্রাণ পরিশ্রম করে তবে উত্তম পেনিসিলিন-নির্যাস বের করতে পারলেন। এইভাবে তাঁরা যা পেলেন তা ফ্লেমিং-এর তৈরি দ্রব্য থেকে অনেক উন্নত বটে কিন্তু তবুও এতে খাঁটি ওষুধ-অংশ ছিল মাত্র শতকরা পাঁচভাগ।

একদিকে যেমন একদল বৈজ্ঞানিক ঐ শুদ্ধ-ওষুধ নিষ্কাশন তত্ত্বে মন দিলেন, অপর দিকে আর একদল পেনিসিলিন-বিষয়ক অন্যান্য গবেষনায় মেতে গেলেন। তাঁরা দেখলেন রাসায়নিক গুণে পেনিসিলিন অম্ল জাতীয়, যা বায়ু ও সামান্য তাপের প্রভাবেই নষ্ট হয়ে যায়! তখন তাঁরা পেনিসিলিনের লবন বা জমাট পেনিসিলিন বানালেন, সেটা সহজে নষ্ট হয় না।

এর পরে তাঁদের এই ওষুধের মাত্রার একটা 'একক' বা মান স্থির করার দরকার হল, যা দিয়ে মেপে তাঁরা পরীক্ষার জন্যে ঠিক মাত্রার ওষুধ তুলে নিতে পারেন। অথবা ডাক্তাররাও রোগীর চিকিৎসায় রোগের তারতম্য অনুসারে মাত্রারও তারতম্য স্থির করে ব্যবহার

করতে পারেন। এই কাজটা সমাধা করবার কাজে ডাঃ চেইন সব চেয়ে বড় অংশ গ্রহণ করলেন।

তাঁরা দেখলেন পেনিসিলিন সলিউশনের অতি অল্প পরিমাণ ওষুধ বিশেষ কয়েকটি অবস্থায় স্ট্রেপ্টোকক্কাস জাতীয় ২৫,০০,০০০ জীবাণু মেরে ফেলতে সক্ষম হয়। তখন ঐ পরিমাণ ওষুধকেই তাঁরা ন্যূনতম মাত্রা বা এককের মাপ হিসাবে নির্ধারিত করে নিলেন।

এইবার তাঁরা সঠিকভাবে এগোতে পারবেন।

জীবাণু নাশের পরীক্ষা

যদিও ডাঃ ফ্লেমিং পেনিসিলিন নিয়ে তার জীবাণু-নাশক শক্তির পরীক্ষা করে ছিলেন, তবু অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা নিজেরা বিবিধ রোগ-জীবাণুর ওপর সেটা পরীক্ষা করে নিতে চাইলেন। এছাড়া তাঁদের আরো জেনে নিতে হবে কোন্ কোন্ শ্রেণীর জীবাণুর ওপর এই পেনিসিলিনের ক্রিয়া সহজে কার্যকরী হয়, কোন্গুলিই বা এর সংস্পর্শে সহজে মরে। যে সব জীবাণু মানুষকে সচরাচর আক্রমণ করে তাদের মধ্যে স্ট্রেপ্টোকক্কাস ও স্টাফিলোকক্কাই প্রধান। তাঁরা এই শ্রেণীর আশিটা বিভিন্ন প্রকারের জীবাণুর ওপর পেনিসিলিন পরীক্ষা করলেন। দেখলেন এ ওষুধ কতকগুলি বেশ উগ্র ও মারাত্মক জীবাণুর ওপর বেশ কাজ করে এবং নরম ও শান্ত জীবাণুদের ওপরও বেশ ক্রিয়াশীল, তবে কম বেশি মাত্রার ওপর নির্ভর করে, এই যা।

তারপর তাঁরা দেখতে লাগলেন পেনিসিলিন ওষুধ মানুষের শরীরে সঞ্চারিত করলে কী ভাবে প্রবাহিত হয়, কতটা শরীরতন্ত্রে গৃহীত হয়, কতটাই বা টিস্যু', পাকস্থলী ইত্যাদিতে থিতিয়ে থাকে,

কতটাই বা মলমূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায় কতক্ষণেই বা বেরিয়ে যায়!

প্রথমে খরগোস ও ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করা হয়। দেখা গেল ওষুধের বেশির ভাগ মলমূত্র ও ঘামের সংগে বেরিয়ে যায়। এটা চিকিৎসকদের জানা দরকার যাতে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত পরপর নতুন মাত্রা প্রয়োগ করে যেতে পারেন।

তাছাড়া তাঁদের আরো পরীক্ষা করে দেখবার ছিল, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধি সারাতে ওষুধটা সমান কার্যকরী কিনা? সবসময় এটা একভাবে কাজ করে, না অবস্থা ভেদে বিফল হয়? আরু-সালফা ওষুধ ব্যবহার করতে করতে শরীরে প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়; এ ওষুধেও তা হবে কিনা?

সাঙ্ঘাতিক রোগে আক্রান্ত কতকগুলি খরগোসের ওপর পেনিসিলিন পরীক্ষা করা হল। তাতে এঁরা আশাতীত ভাল ফল পেলেন। প্রায় সব খরগোসগুলিই সেরে গেল। অক্সফোর্ড-বিজ্ঞানীরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, ডাক্তার ফ্লেমিং পেনিসিলিনকে রোগ-বিনাশে অমোঘ সাব্যস্ত করে বাড়াবাড়ি কিছু করেননি। তাঁরা প্রথমে এ সম্বন্ধে যতটা আশা করেছিলেন তার থেকেও ভাল কাজ দেখিয়েছে।

এইবার তাঁরা চরম পরীক্ষার দিকে এগোলেন, যে পরীক্ষায় ডাঃ ফ্লেমিং কোন সহযোগিতাই এ পর্যন্ত পাননি। ডাক্তাররা কোন নতুন ওষুধ মানুষের ওপর প্রয়োগ করবার সময় এমন সমস্ত রোগী বেছে নেন যাদের বাঁচবার আশা একেবারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন ওষুধ হয়ত তাদের সারিয়ে ফেলতে পারে, আবার ওষুধটা ব্যর্থ হলেও ক্ষতি হবে না, কারণ রোগীর অবস্থা তখন সমস্ত আশা ভরসার বাইরে।

ডাঃ ফ্লোরি মানুষের ওপর পেনিসিলিন প্রয়োগ করবার আগে অক্সফোর্ডে র‍্যাডক্লিফ হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে বিষয়টা আলোচনা করতে বসলেন। এই চিকিৎসকদের মধ্যে একজন ছিলেন ডাঃ মেরী ফ্লোরি—তাঁর নিজেরই স্ত্রী।

ডাঃ মেরী ফ্লোরি বললেন—এখানে হাসপাতালে আমার অধীনে একটি রোগী আছে, তার বাঁচবার কোন আশা নেই। তার ওপর পেনিসিলিন প্রয়োগ করে দেখলে কেমন হয়, যদি সে ওতে বেঁচে যায়!

ডাঃ হাওয়ার্ড ফ্লোরি বললেন—

বেশ, বেশ! চল আমরা তাহলে রোগীটা একটু দেখে আসি। ডাঃ মেরী ফ্লোরি তাঁদের নিয়ে সেই রোগীর শয্যাপার্শ্বে হাজির হলেন। এবং রোগীর অবস্থাটা ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন।

রোগী একজন পুলিশ-প্রহরী, তার শরীরে ভীষণ রক্ত-দুষ্টি হয়েছে। কোন ওষুধই খাটছে না। তার অবস্থা ক্রমশ খারাপই হচ্ছে, আর রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তার সমস্ত শোনিত-প্রবাহই দূষিত হয়ে উঠেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সে মারা গেল বলে! তাইত, এই রোগীকে কি পেনিসিলিন বাঁচাতে পারবে?

ডাক্তাররা এযাবত যতটুকু পেনিসিলিন-ওষুধ সঞ্চয় করতে পেরেছেন সেই অল্প পরিমাণই সবটুকু আনিয়ে নিলেন। তারপর তাড়াতাড়ি যোগাড়-যন্ত্র করে প্রস্তুত হয়ে নিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জলমিশ্রিত পেনিসিলিন-প্রবাহ লোকটির শিরায় প্রবিষ্ট হল।

তাঁরা কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর এই ওষুধ প্রয়োগ করতে থাকলেন। সারা দিন-রাত্রি ধরে এই চিকিৎসাই চলল। পরদিনও তাই। মনে হয় যেন রোগীর স্পষ্ট উন্নতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

চিকিৎসা চলল। দেখা গেল পুলিশটা যেন ধীরে ধীরে ভালর দিকেই যাচ্ছে, এ যাত্রা বেঁচে যেতেও পারে!

ডাক্তাররা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কিন্তু হায়, পেনিসিলিন-সঞ্চয় ইতিমধ্যে নিঃশেষ হযে এল! যে উন্নত অবস্থায় রোগী উপনীত হলে রক্তের শ্বেতকণিকাগুলিই থাকি রোগটা জয় করতে পারত তার আগেই সঞ্চিত পেনিসিলিন গেল ফুরিযে। রোগীর দেহে আবার জীবাণু-সংখ্যার বৃদ্ধি হতে লাগল। শেষে লোকটা মারাই গেল।

ডাক্তাররা ভাবলেন, যদি আর একটু বেশি পেনিসিলিন আর এই ওষুধ সম্বন্ধে আরো একটু বেশি জ্ঞান থাকে, তাহলেই ত আমরা পরবর্তী রোগীকে বাঁচাতে পারব। এরকম গুরুতর ব্যাধির ক্ষেত্রে সত্যি আমাদের হাতে অনেকটা ওষুধ আগে থাকতে জমিযে রাখা চাই।

আবার নতুন উৎসাহে কাজ সুরু হ'ল। ধীরে অতি ধীরে, খুব যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে তাঁরা আবার খানিকটা ওষুধ সঞ্চয় করলেন। তারপর ডাঃ হাওযাড ফ্লোরি ও ডাঃ রবার্ট উইলিযমস যখন বুঝলেন—হ্যাঁ, আবার কাজে হাত দেবার মত যথেষ্ট ওষুধ হাতে জমেছে, তখন তা নিয়ে চললেন বার্মিংহাম হাসপাতালে—আহত সৈনিক ও নাগরিকদের চিকিৎসা করতে। তাঁরা কতকগুলি বিষাক্ত ক্ষতের রোগী বেছে নিলেন, কিন্তু রোগীগুলি একেবারে মারাত্মক অবস্থায় ছিল না। রোগী-পিছু খুব কম পেনিসিলিন খরচ হল, তাই মোট ২১২ জন রোগীর চিকিৎসা করতে পারলেন।

এইবারকার চিকিৎসায় ডাক্তাররা একটু অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তাঁরা ক্ষতগুলির ওপরে শুকনো গুঁড়ো-পেনিসিলিন

মাখিয়ে দিলেন। তারপর পেনিসিলিন-সলিউশনে গজ চুবিয়ে নিয়ে তা ক্ষতের ভেতর পুরে ক্ষত বেঁধে দিলেন। সন্থ সন্থ ফল পাওয়া গেল। কয়েক দিনের ভেতরই সব ঘাগুলি শুকিয়ে গেল। আগে এইরকম ঘা সারতে যতটা সময় লাগত এ চিকিৎসায় তার আংশিক লাগল। আর সারার পর ঘায়ের যে দাগ থাকে তাও এক্ষেত্রে অতি সামান্য রইল। এই ব্যাপার থেকে রোগীরা বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল। ডাক্তারাও আনন্দে মেতে উঠলেন, কেননা পেনিসিলিনের আরোগ্য শক্তির একটা বড় দরের প্রমাণ তাঁরা এখানে পেলেন।

তাঁরা ভাবলেন, এই ওষুধ ত এখনো ল্যাবরেটরি-জাত শিশু বিশেষ ; এর সম্যক উন্নতি ও বৃদ্ধি এখনো হয়নি, তাতেই যদি এমন ভাল কাজ দেয় ত যখন এটা কারখানায় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হবে ও সারা জগতের হাসপাতালে ব্যবহৃত হবে তখন এর দ্বারা আরো কত ভাল চিকিৎসা হতে পারবে এবং মানুষের কী বিপুল উপকারই না সাধিত হবে !

অতলান্তিক পেরিয়ে

এবার এই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ঔষধটি কারখানায় অধিক পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যে উৎপাদক কোম্পানি এ কাজে হাত দেবে তাদের নিশ্চয় ঐ সূক্ষ্ম ছত্রকটি বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে আর তার থেকে ওষুধাংশ নির্যাসটাও বেশি পরিমাণে নিষ্কাশিত করতে হবে। কিন্তু তা করতে গেলে এর পেছনে যে ভয়নক খরচ পড়বে। কাজেই কোন ওষুধ-ব্যবসায়ী কোম্পানিই এ অবস্থায় এটা তৈরি করতে গিয়ে ফতুর হতে রাজি হবে না।

সে সময় জার্মানি ও তার মিত্রশক্তির সঙ্গে ইংলণ্ড তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। এমন কোন কারখানা বা কর্মী ছিল না যারা কোন না কোন যুদ্ধ-সম্পর্কিত জিনিস তৈরিতে ব্যস্ত না ছিল। তাছাড়া এও ভাববার ছিল, যদি কোন কারখানা সরকারি সহায়তায় এ ওষুধ তৈরি করতে নামে, যে কোন মুহূর্তে বোমাবর্ষণে ধ্বংস হতে পারে; তাহলে ত সবই গেল! আবার এদিকে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ইংলণ্ডবাসীদের এ ওষুধ না হলেও আর চলছিল না।

ডাঃ ফ্লোরি সরকারি কর্মচারীদের কাছে এই সমস্যাটা নিবে আলোচনা তুললেন। আলোচনান্তে সিদ্ধান্তটা ডাঃ ফ্লোরির মুখ দিয়ে এই রকম বেরুল—আমরা এই ছত্রকটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিযে যাব। দেখা যাক, ওদেশের বৈজ্ঞানিকরা এ ওষুধ প্রস্তুত করবার কোন উন্নত ধরণের পন্থা বার করতে পারে কিনা। সেখানকার ওষুধ-উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলিও এমন কিছু করতে পারে কিনা যাতে খুব বেশি পরিমাণে উৎপাদন সম্ভব হয়।

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে সেই পেনিসিলিযাম-ছত্রক সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলল আমেরিকার পথে। এটা ডাঃ ফ্লোরির গবেষণাগারে সযত্ন-বর্ধিত ছত্রক, কিন্তু মূলে এটা ছিল বারো বৎসর আগে ডাঃ ফ্লেমিএর জীবাণু-গবেষণার পাত্রে আবির্ভূত সেই ছত্রকেরই একটা অংশ। যাহোক, পেনিসিলিযাম ছত্রকটি একটা কাচের টিউবে ধৃত হয়ে ডাঃ হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও ডাঃ হিটলির তত্ত্বাবধানে আমেরিকায় চলল।

ইতিমধ্যে আমেরিকাতে পেনিসিলিন সম্বন্ধে কিছুটা আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দেখা দিয়েছিল। কেবল রকফেলার ইনস্টিটিউট অফ-মেডিক্যাল রিসার্চই যে এ বিষয় জানত তাই নয়, অন্যান্য

বৈজ্ঞানিকরাও ডাঃ ফ্লেমিং এবং ডাঃ ফ্লোরির গবেষণার বিবরণ পড়ে এ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন

ডাঃ ফ্লোরি ও ডাঃ হিটলি আমেরিকায় পৌঁছে আগে রকফেলার ফাউণ্ডেশানের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন, তারপর তাঁরা যুক্ত-রাষ্ট্রের সরকারি কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করতে ওয়াশিংটনে গেলেন। চার্লস টম নামে একজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ও ছত্রক-বিশারদ এই ইংরাজ ডাক্তারদের পাঠিয়ে দিলেন ইলিনয়ের নর্দার্ন রিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে। এটা একটি কৃষি-বিজ্ঞান-মূলক গবেষণাগার। এ গবেষণাগারটি আমেরিকার কৃষি-কর্মী, শিল্পী ও সাধারণ প্র পুঞ্জের উপকারার্থে রাসায়নিক পদার্থ ও অণুবীক্ষণগ্রাহ্য সজীব পদার্থের বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ডাঃ ফ্লোরি ও হিটলি সেখানে গেলেন ও ফার্মেণ্টেশান (জীবাণু ও ছত্রক দ্বারা দ্রব্যের বিকার) সম্পর্কিত গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টার ডাঃ কগহিল ও ঐ প্রতিষ্ঠানের আরো ক.য়কজন সদস্যের সঙ্গে দেখা করে পেনিসিলিন উৎপাদন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন।

ডাঃ কগহিল বললেন—দেখুন, বর্তমান অবস্থায় কোন ওষুধ-কোম্পানিই পেনিসিলিন উৎপাদনের কাজ হাতে নিতে রাজি হবে না—এ পরিষ্কার জানবেন। আর সকলেও সেই মতে সায় দিলেন।

তারা পারবে কোথা থেকে? বুঝছেন না, ও করতে গেলে স্রেফ সর্বস্বান্ত হবে যে. এক ‍জন বিজ্ঞানী বললেন।

কিন্তু তার আগে এই ওষুধটা নিয়ে এখনো বিজ্ঞানীদের অনেক কিছু করবার আছে জানবেন। অপর একজন বিজ্ঞানী বললেন।

ডাঃ কগহিল বললেন, ঠিক বলেছেন।

এই বলে তিনি তাঁর সারা বিজ্ঞান-পরিষদকে ডাক দিলেন ও তাঁদের মধ্যে ছত্রকের উন্নতিমূলক গবেষণার কাজ বণ্টন করে দিলেন। তার মধ্যে ছজন বৈজ্ঞানিককে খাস পেনিসিলিন সম্পর্কেই শুধু চর্চা করতে নির্দেশ দিলেন। পরদিন থেকেই পেনিসিলিয়াম ছত্রক ও তন্নিষ্কাশিত নির্যাস নিয়ে গুরুতর গবেষণা শুরু হয়ে গেল।

তখন ইউরোপ ভূখণ্ডে সমরবহ্নি লেলিহান শিখায় প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল। সুদূর প্রাচ্য-প্রান্তে জাপানবাসীরা নাৎসিদের কর্মকলাপ লক্ষ করছিল, আর এদের শক্তি-মদমত্ততা ও দুর্বার আসুরিকতাকে যেন ঈর্ষা করছিল। শেষে তারাও সমস্ত শক্তি নিয়ে এই নাৎসিদের অনুরূপই বর্বর নৃশংসতায় নেমে পড়ল। তারাও চায় রণদুর্মদ তাণ্ডবে মেতে জগত জয় করতে, সসাগরা ধরণীর শাসক হতে। দেখতে দেখতে যুদ্ধের ভয়াবহ মসী-কৃষ্ণ ঘন-ঘটা আমেরিকার দিক চক্রবালেও ঘনায়মান হয়ে উঠল।

সমস্ত চেতনা উন্মুখ করে ও সর্বশক্তি নিয়োজিত করে কাজ করে চললেন নর্দার্নরিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির বৈজ্ঞানিকেরা এই যুদ্ধাশঙ্কার জন্যেই। কেননা পেনিসিলিনের এখনই বড় প্রয়োজন, আর যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ত পেনিসিলিনের দরকার হাজারগুণ বেড়ে যাবে।

পারিবনা একথাটি বলিওনা আর

ডাঃ কগহিলের বিভাগেরই একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন ডাঃ কেনেথ রেপার। তিনি একটু উন্নত ধরণের ছত্রক চাষের চেষ্টায় ছিলেন। তিনি ঐ জিনিসটা কাচের বোতলের মধ্যে যত বেশি সম্ভব গজাবার চেষ্টা করছিলেন। এই পথে প্রথম পথপ্রদর্শক ডাঃ ময়ার-এর মত ইনিও ছত্রকের খাদ্য বদলে নতুন খাদ্য দিয়েছিলেন।

ডাঃ রেপার তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছত্রক-খণ্ডগুলিকে প্রত্যহ লক্ষ করছিলেন কাচের পাত্রে। প্রথমে ছোট্ট একটা ছত্রক বৃদ্ধি পাবার জন্যে নিজের অংশ বিস্তার করতে আরম্ভ করল। বর্ধিত ছত্রকের হয়ত কোন অংশ তেজহীন দুর্বল তাই অতি অল্পই বেড়েছে, কোনটা হয়ত প্রমাণ আকারের হয়েছে ও যথোপযুক্ত ঘনও হয়েছে। কিন্তু দু-একটা এমন দেখা যেত যা আকারে বেশ বড় ও জোরালো চেহারার হয়ে উঠেছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ছত্রকগুলি ডাঃ রেপার অমনি একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রে তুলে সরিয়ে নিতে লাগলেন এবং সেগুলিকে অন্য বোতলে রেখে বর্ধন করতে লাগলেন। এইরকম ছত্রক-বাছাই কাজ বার বার করে, তিনি উত্তরোত্তর বড় ও উৎকৃষ্ট পেনিসিলিয়াম ছত্রক গজিয়ে তুলতে সমর্থ হলেন।

ছত্রকের উৎকর্ষ সাধন হওয়াতে ডাঃ রেপার তাঁর নির্যাসে ঔষধাংশও অধিক পেতে লাগলেন। তবুও এ যে খুব যথেষ্ট ও কাজের হল তা বলা যায় না। তারপর তিনি বিভিন্নপ্রকার এই ছত্রকেরই সন্ধানকার্যে মন দিলেন। এই মতলবে তিনি ও ডাঃ কগহিল প্রথমে সেনাদলের সহায়তা চাইলেন। তখনো

আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নামেনি তবুও আমেরিকান বিমান-বাহিনী দূর-দূরান্তে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে ঘাঁটি গড়ছিল। ডাঃ রেপার বিমান চালকদের অনুরোধ করে পাঠালেন তারা যে দেশেই যাক না কেন, সেখানকার খানিকটা মাটির নমুনা যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসে এবং তা নর্দার্ন রিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দেয়—ডাঃ রেপার সেগুলি ছত্রক-গবেষণা সম্পর্কে পরীক্ষা করবেন।

সেনাবাহিনীর লোকেরাও ইতিমধ্যে পেনিসিলিনের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল। ইউরোপ এবং দূর প্রাচ্যে যুদ্ধাশঙ্কা দিনদিন বাড়ছিল বৈ কমছিল না, কাজেই সৈন্য ও সামরিক কর্মী মাত্রেই ক্ষতজনিত-মৃত্যু থেকে বাঁচবার মত ওষুধের আবশ্যকতা উপলব্ধি করছিল। তারা ডাঃ রেপারের এই অনুরোধে নর্দার্ন রিসার্চ ল্যাবরেটরির বৈজ্ঞানিকদের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করতে রাজি হল।

সত্যই দেখা গেল আলাস্কা, হাওয়াই, ফিলিপাইন ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে তারা ভাল ভাল মাটি এনে সরবরাহ করতে লাগল ডাঃ রেপারকে।

তারপর আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেওযার পর ইউরোপ ও এশিয়া থেকেও মাটি এল। ডাঃ রেপার তাঁর সহকারীদের নিযে এইসব মাটি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন যদি তাঁদের ছত্রকের অনুরূপ কোন ছত্রকের চিহ্ন পাওয়া যায়। কতকগুলি মাটি দেখে মনে হল ভাল পেনিসিলিন ছত্রক জন্মাতে পারে। তবে খুব ভাল কিছু নয়।

তারপর একদিন ডাঃ রেপার পিওরিয়ার একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথের ধারে একটা আড়তে ফল ও তরিতরকারি

ডাঁই করা রয়েছে। তাঁর কী খেয়াল হল সেখানটায় থেমে সেদিকে একটু উঁকি দিয়ে কী দেখতে গেলেন। হঠাৎ দেখেন কী, একটা পাকা খরমুজের গায়ে খানিকটা বাগানের মাটি তখনো লেগে রয়েছে, আর তাতে একটুখানি ছাতাও ধরেছে—এই দেখে তাঁর ঔৎসুক্য ভয়ানক বেড়ে উঠল।

অমনি তাড়াতাড়ি তিনি সেই ফলটাকে কিনলেন আর ফড়িয়াকে বললেন—এই খবরদার, তুমি যেন ওটাকে হাত দিয়ে তুলতে যেওনা, ওটা ঠিক যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই আমি নিজে হাতে করে তুলে নিচ্ছি। দেখছ না, খোসার গায়ে কী একটা লেগে রয়েছে, ওটা নিয়ে আমি গবেষণা করব।

লোকটি ব্যাপারখানা কী বুঝতে পারল না। সে ভাবল, লোকটা পাগল। নইলে একটি পাকা ফুটি কিনেছে তার মনোযোগ আর কোন দিকে নেই, তার শাঁস চুলোয় গেল, নজর কিনা খোসার গায়ে কী একটু ময়লা লেগে আছে তার দিকে! লোকটি ডাঃ রেপারের দিকে অবাক হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

কিন্তু ডাঃ রেপার নিজের চিন্তায় এমনি তন্ময় ছিলেন তার সে ভাব লক্ষই করলেন না। আর তাছাড়া কে কী মনে করছে না করছে গ্রাহ্য করার তিনি লোকই নন।

তিনি ফুটিটি সোজা তার গবেষণাগারে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি খোসা থেকে ছাতাটা আলাদা করে নিলেন ও তার টুকরোগুলি বিভিন্ন কাচের বোতলে পূর্ব থেকে প্রস্তুত রাখা কাথের মধ্যে রেখে দিলেন বাড়বার জন্যে। বোতলে বোতলে ভাগ করে তিনি গুণে দেখলেন সবশুদ্ধ ৮৩১টি হয়েছে। তারপর থেকে কয়েকদিন ধরে তিনি বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে ছত্রকগুলি বাড়াতে লাগলেন। দেখলেন এই নতুন 'ছত্রক' শুধু যে কেবল কাথের

গায়েই জন্মাচ্ছে তা নয়, কাথের সমস্ত জলীয় ভাগটায়—ওপরে, নিচে, সব জায়গায় বেশ জন্মাচ্ছে। বাঃ চমৎকার আবিষ্কার!

এই আবিষ্কারের ফলে প্রতি বোতলে পেনিসিলিন ছত্রকও বেশি পরিমাণে জন্মাতে লাগল। আর সেই ছত্রক থেকে নিষ্কাশিত নির্যাসও ওষুধের ভাগ অনেক বেশি হতে দেখা গেল। ডাঃ রেপার এ দেখে উৎসাহে মেতে উঠলেন। এই যে খরমুজটির গায়ে দৈবাৎ যে ছত্রকটি পাওয়া গেল এটাই কিনা মাস কয়েক ধরে খুঁজে মরছিলেন!

এই আবিষ্কারের ফলে দুটো বাধা, যা ওষুধ ব্যবসায়ীদের পেনিসিলিন তৈরি করার প্রধান অন্তরায় ছিল, তা কেটে গেল। প্রথমত এই ছত্রকগুলি বড় বড় চৌবাচ্চায় খুব বেশি সংখ্যায় পাইকারি ভাবে উৎপন্ন করা যেতে পারবে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল যে কাথের ওপর ছত্রক জন্মাচ্ছিল তারও খানিক উৎকর্ষ হওয়ার ফলে পেনিসিলিন নির্যাস আরো বেশি পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হল।

এদিকে ডাঃ এণ্ড্, ময়ার ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ডাঃ হিটলির সঙ্গে গবেষণা কার্য চালাচ্ছিলেন। তাঁদের মাথায় এল যে-কোন সজীব পদার্থ—উদ্ভিদ বা প্রাণী ভাল খাদ্য পেলে বেশ ভালভাবে বেড়ে ওঠে। সেই অনুসারে ডাঃ ময়ার তরল পদার্থের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন কিসে ছত্রকটা বেশ ভাল বাড়ে। প্রথম প্রথম তিনি তেমন লক্ষণীয় কোন ফল পেলেন না, হয়ত একটুখানি বাড়ল—বাস্ ঐ পর্যন্ত! এমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা গেলনা। সত্যি বলতে এঁরাও ইংরাজ বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে এমন কিছু বেশি উন্নত ধরণের পেনিসিলিন তৈরি করতে পারলেন না।

তারপর তিনি ঠিক করলেন শস্য-ভিজানো জল ব্যবহার করে দেখবেন। এ জিনিসটার রাসায়নিক উপাদান অবশ্য তিনি জানতেন। এটা একটা বাজে পদার্থ। শ্বেতসার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে জলে শস্য ডুবিয়ে রাখা হয় এটা সেই জল। খানিকটা শস্য-ভিজানো জল বোতলে ঢেলে তাতে কয়েকটা ছত্রক ছেড়ে দিলেন বাড়বার জন্যে। তারপর কয়েকদিন ধরে, ফলাফল লক্ষ করতে লাগলেন। ছত্রক অবশ্য আগের মতই বাড়তে লাগল, ক্বাথের মধ্যেও যেমন বাড়ছিল তেমনি, তার থেকে বেশি বড়ও নয়, ঘনও নয়। তারপর ছাতাটা যখন পূর্ণাবয়ব হল ডাঃ ময়ার জলটা ঢেলে ফেললেন, আর ডাঃ হিটলি পেনিসিলিন উপাদানটা পরীক্ষা করলেন।

পরীক্ষা করে ডাঃ হিটলি ও ডাঃ ময়ার দুজনেই কিন্তু খুব আশ্চর্য হলেন। কারণ দেখা গেল শস্য-ভিজানো জলে ছত্রক বাড়তে দিয়ে এর আগে পর্যন্ত যে ওষুধাংশ পাওয়া গেছে তার দ্বিগুণ পাওয়া গেল। এইভাবে ডাঃ ময়ার ও ডাঃ হিটলির দুজনের মিলিত আবিষ্কারে পেনিসিলিন উন্নতির পথ এগিয়ে চলল।

বৈজ্ঞানিকেরা যখন এইভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন সে সময় জাপানীরা ওদিকে পার্ল-হারবার ও হাওয়াই দ্বীপে যুগপৎ আমেরিকার স্থলসেনা ও নৌবাহিনীকে আক্রমণ করে বসল। একদিকে যেমন আমেরিকান সৈনিকেরা সুদূর প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ ও মহাসাগরের বুকে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগল, অন্যদিকে তেমনি বৈজ্ঞানিকেরাও অনন্যমনা হয়ে কাজ করে চললেন অবিশ্রান্ত, অনলসভাবে। আরো এক বছর কাটল, আমেরিকান সৈন্য ইটালিতে ও ক্রমে ফরাসি দেশে অবতরণ করল।

ইতিমধ্যে ডাঃ রেপার ও ডাঃ ময়ার পেনিসিলিন উৎপাদন সম্পর্কিত দুটো বেশ বড় সমস্যা সমাধান করলেন—সে হল ১৯৪৩ সালের কথা।

পেনিসিলিন স্বরূপ পেল

১৯৪৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বছর দুই যুদ্ধ চালানো হয়েছে; আমেরিকা ও ইংলণ্ড উভয় দেশেই পেনিসিলিনের প্রয়োজনীয়তা ভয়ানক হয়ে উঠেছে। এখন ওষুধ-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ করা হল এই নতুন ওষুধ সামরিক হাসপাতালের জন্যে তৈরি করতে। কিন্তু অধিকাংশ কোম্পানিই মনে করল এ ওষুধ পাইকারি পরিমাণে উৎপন্ন করা এত বেশি ব্যয় সাপেক্ষ যে তাদের পক্ষে হঠাৎ কাজে নামা সম্ভব নয়।

সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি, রুজভেণ্ট তাঁর জ্ঞান ও দূরদৃষ্টিবলে সামরিক উপকরণ ও জন-নিরপত্তার উপায়,—এ দুয়ের উদ্ভাবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন এবং এ সম্পর্কে কাজ করার জন্যে একটা সরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন। এর নাম হল OSRD—অর্থাৎ Office of Scientific Research and Development বা—বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠান। এতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও ওষুধ সম্পর্কিত উন্নতিতে সহায়তা করার জন্যে স্বতন্ত্র একটা বিভাগ ছিল। এই সরকারি প্রতিষ্ঠানেরই উৎসাহ ও প্রচেষ্টা গুণে পেনিসিলিন যথা সময়ে উৎপন্ন হবার ব্যবস্থা হয় ও মানুষের জীবন রক্ষার সুরাহা হয়। কারণ যে কোন বে-সরকারি ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান ওষুধ উৎপাদনে এগোবে তাদের এঁরা আর্থিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করতে প্রস্তুত ছিলেন। এ ছাড়াও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য

উপকরণ যা লাগবে তাও দিতে সম্মত হলেন। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে চারটি আমেরিকান ঔষধ-উৎপাদক-প্রতিষ্ঠান পেনিসিলিন প্রস্তুতের যন্ত্র ও আধার প্রতিষ্ঠা করল, পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে আরো আঠারটি আর কানাডাতেও দুটো স্থাপিত হল, এবং কাজ শুরু করল।

প্রথমে পেনিসিলিন উৎপাদন ব্যাপারটা খুব নতুন বলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিভিন্ন উৎপাদক-প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিলেন, এই ওষুধ তৈরি করতে যেন এক একজন এক এক পদ্ধতি গ্রহণ করে—এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় প্রস্তুতি পরীক্ষা করে আগে বের করা হোক কোন্ পন্থায় সহজে বেশি পরিমাণ পেনিসিলিন তৈরি হতে পারে। তাই কেউ কেউ বোতলে, কেউবা চৌবাচ্চায় পেনিসিলিন ছত্রক জন্মাবার ব্যবস্থা করলেন। এক একটা বড় বড় ওষুধের কারখানায় দিনে ৩৫,০০০ থেকে ৩৮,০০০ কাচের বোতল পেনিসিলিন উৎপাদনের কাজে কর্মীদের হাতে হাতে ওঠা নামা করতে লাগল। কিন্তু যারা চৌবাচ্চায় চাষ করছিলেন, তারাই ভাগ্যবান, কারণ পরে দেখা গেল এটিই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

এতগুলি কোম্পানি একযোগে পেনিসিলিন উৎপাদনে নিয়োজিত হলেও যে পরিমাণ ওষুধ পাওয়া যেতে লাগল, ডাক্তাররা দেখলেন প্রয়োজনানুপাতে সেটা কিছুই নয়, অথচ পেনিসিলিনের প্রয়োজন অনেক বেশি; সামরিক হাসপাতাল ছাড়াও অসামরিক নাগরিকদের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় বোধে স্থানীয় হাসপাতালগুলিকে কিছু কিছু দিতে হবে। কিছু পরিমাণ পেনিসিলিন আবার ইংলণ্ডকে বিক্রি করতে হবে, কানাডায় দুটো কোম্পানিতে যা প্রস্তুত হচ্ছিল তা তাদের প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত নয়। এই ইংরাজেরাই আমেরিকার কাছে প্রথম

পেনিসিলিন-তত্ত্বটা নিয়ে আসে। তারা এই জিনিসের আবিষ্কার এবং তার সম্বন্ধে এত বছরের গবেষণা ও পরীক্ষার ফল আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছে। কাজেই তাদের দাবি সবচেয়ে বেশি এবং এবার তাদের ন্যায্য প্রাপ্য পাওয়া উচিত। তাছাড়া ইংরাজেরা অনেকদিন ধরেই যুদ্ধ চালিয়ে আসছিল তাই তাদের প্রয়োজনও বেশি। তার উপর তারাও আমেরিকার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একযোগে যুদ্ধ করছে।

ডাঃ চেস্টার কীফারকে নিযুক্ত করা হয়েছিল প্রতিবিন্দু পেনি-সিলিন যাতে ঠিক যেখানে একান্ত দরকার সেখানে ছাড়া অন্যত্র না যায় তার খবরদারি করতে। প্রথম অল্প পরিমাণ পেনিসিলিন স্থল ও নৌ-বিভাগের ডাক্তারদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল, যাতে যুদ্ধে আহত সৈনিকদের জীবনগুলি বাঁচানো যায়। তারপর আরো খানিকটা অল্পপরিমাণ ওষুধ পাঠানো হল অসামরিক হাসপাতালে, সেখানে অভিজ্ঞ ডাক্তাররা যাতে এই ওষুধ প্রয়োগের সুষ্ঠু পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আর এই সব ডাক্তারদের নির্দেশ দেওয়া হল তাঁরা রোগীদের যে পদ্ধতিতে পেনিসিলিন প্রয়োগ করে যে রকম ফল পাবেন তার বিশদ বিবরণ যেন ডাঃ কীফারের নিকট পাঠিয়ে দেন।

এইভাবে প্রয়োগদ্বারা পরীক্ষার ফল জেনে জেনে পেনিসিলিন সম্বন্ধে জ্ঞান আরো পাকা হতে লাগল আর তা থেকে ওষুধটাকে আরো ফলদায়ক, আরো নির্ভরযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়ে উঠল। এই করতে করতে সুনিশ্চিত জ্ঞান জন্মে যাওয়ায় অনভিজ্ঞ ডাক্তারদের নির্দেশ দেবার জন্যে একটা বিধান-পুস্তক রচনা করা সম্ভব হল।

পেনিসিলিন প্রকৃতই একটা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ওষুধ।

আহতদের চিকিৎসায় ফল আশাতীত ভাল। তাই সেনাবিভাগের ডাক্তাররা এ ওষুধ আরো চেয়ে ঘন-ঘন অনুরোধ করে পাঠাচ্ছিলেন। সরকার ওষুধ উৎপাদনকারী ব্যবসায়ীদের বেশি পেনিসিলিন তৈরি করার জন্যে অতিরিক্ত যন্ত্র, উপকরণ সব যোগাচ্ছিলেন। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি ওষুধটার বর্তমান চাহিদা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা দেখে নতুন আগ্রহ ও উৎসাহে অজস্র টাকা ঢেলে বেশি পরিমাণে তৈরি করতে লাগলেন।

পেনিসিলিন প্রয়োগে যুদ্ধে আহতরা দিনের পর দিন রক্ষা পেতে লাগল। এদের অফুরন্ত চাহিদা মেটাবার জন্যে প্রায় সমস্ত উৎপাদনটুকু সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় হবে নির্দেশ দেওয়া হল। কিন্তু অসামরিক ডাক্তাররা মারাত্মক রোগীদের জন্যে পেনিসিলিন চেয়ে ডাঃ কীফারের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন। ডাঃ কীফার অত্যন্ত প্রয়োজন বুঝে দৈনিক আমদানি থেকে সামান্য অংশ তাদের জন্যে বরাদ্দ করলেন। এই রোগ বিজয়ী ঔষধের ছোট ছোট মোড়কগুলি জরুরি প্রয়োজনে বিমানে করে উড়ে চলল অরিগন, টেকসাস বা মেইনে বিপন্নদের জীবন বাঁচাতে। ছোট-খাট রোগের জন্য পেনিসিলিন ব্যয় করতে দেওয়া হচ্ছিল না। কেননা যুদ্ধে আহতদের জীবন বাঁচানোর কাজে এর প্রয়োজন ছিল অসামান্য।

ইতিমধ্যে ডাঃ ফ্লোরি ইউরোপের যুদ্ধ এলাকায় কাজ করছিলেন। ডাঃ কগহিল ও তাঁর সহ-বিজ্ঞানীরা পেনিসিলিন গবেষণার শেষ ভার নেবার পর তিনি আমেরিকা থেকে চলে এসেছিলেন। ডাঃ ফ্লোরিকে ল্যাবরেটরি উৎপন্ন যৎসামান্য পেনিসিলিন যা দেওয়া হচ্ছিল, তাই দিয়ে উত্তর আফ্রিকা ও ইটালির যুদ্ধাহত সৈনিকদের চিকিৎসা করছিলেন। আর বিভিন্ন রোগে পেনিসিলিন প্রয়োগের

ফলাফলও তিনি বেশ লক্ষ করে চলছিলেন। তিনি নিত্য নতুন পদ্ধতি ও কম-বেশি বিভিন্ন মাত্রায় এই ওষুধ প্রয়োগ করে কোন পদ্ধতি ও কী মাত্রায় প্রয়োগ প্রশস্ত তা জানবার চেষ্টা করছিলেন এবং সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন।

এদিকে ডাঃ আলেকজাণ্ডার তাঁর অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা নিয়ে লণ্ডনে ল্যাবরেটরিতে সময় কাটালেও এযাবত পেনিসিলিনের উন্নতি ও প্রসার তিনি বরাবর লক্ষ করে আসছিলেন; অক্সফোর্ডে ডাঃ হাওয়ার্ড ফ্লোরির অধীনে এর কতদূর কী অগ্রগতি হয় তাও লক্ষ করেছেন, আবার এদিকে আমেরিকায় এর কতটা উন্নতি হচ্ছে তারও বেশ খোঁজ রেখে আসছিলেন। অবশেষে ডাঃ ফ্লেমিং যেদিন দেখলেন তাঁর সেই পেনিসিলিন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণে কারখানায় উৎপন্ন হচ্ছে ও এটা প্রকৃতই মানুষের জীবন-ত্রাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তাঁর আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রইলনা। যে পেনিসিলিনের ওপর তিনি এতদিন বিশ্বাস রেখে এসেছিলেন তাকে আজ যথার্থ আরোগ্যকারী স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ১৯৪৪ সালে তিনি তাঁর নিজের দেশ ইংলণ্ডেই একটা পেনিসিলিন কারখানা স্থাপিত হতে দেখলেন, আর সেটা আবার জগতের বৃহত্তম কারখানাগুলির অন্যতম হয়ে দাঁড়াল।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ও হাওয়ার্ড ফ্লোরির অবদান— পেনিসিলিন আবিষ্কার ও গবেষণা দ্বারা মনুষ্যজাতির যে উপকার করেছেন তার জন্য গ্রেটব্রিটেন রাষ্ট্র তাঁদের 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করল।

আজকাল সব পেনিসিলিন উৎপাদকেরা কাচের বোতলে পেনিসিলিয়াম ছত্রক জন্মানো ছেড়ে দিয়ে চৌবাচ্চায় জন্মাবার

রীতি গ্রহণ করেছে। কয়েকটি এইরকম বড় চৌবাচ্চার উচ্চতা দ্বিতল প্রমাণ উঁচু, আর তাতে ৯০,০০০ নব্বই হাজার গ্যালন শস্য ভিজানো জল ও সেই অনুপাতে ছত্রক ধরে। এখন পাইকারি-হারে রাশি রাশি পেনিসিলিন উৎপন্ন হচ্ছে। যে কোন রোগীর চিকিৎসার জন্যে এখন পেনিসিলিন ন্যায্য মূল্যে যত ইচ্ছে পাওয়ার কোন বাধা নাই।

এখনো বছরের পর বছর বিভিন্ন দেশে হাসপাতাল, মেডিক্যাল-স্কুল-ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য গবেষণা আবিষ্কার প্রতিষ্ঠানগুলিতেও পরীক্ষা করে এই ওষুধ সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য আহরণ করা হচ্ছে।

বিশ্বজনীন সালফা-ওষুধ

সহৃদয় ব্যক্তিগণ

১৯৩৫ সালের বসন্তকাল। সেদিন প্যারির পাস্তর ইনস্টিটিউটে ডাঃ ফুরনু তাঁর ডেস্কে বসে একটি ওষুধের গুণাগুণ প্রয়োগ, পরীক্ষা প্রভৃতির রিপোর্ট পড়ছিলেন। আধা-বয়সী ভদ্রলোক, চুলে সবে পাক ধরেছে। তাঁর চোখ দুটো দেখে অন্তরের সহতা ও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। এক জন সহকারী সহাস্য মুখে এসে কী যেন বলল, কিন্তু ডাঃ ফুরনু শুধু একটু মুখ তুলে 'সুপ্রভাত' বলেই আবার পড়ায় মন দিলেন।

যুবকটি বলল—আসুন, আপনার জন্যে আমরা লাবরেটরিতে অপেক্ষা করছি সেই পরীক্ষাটা আপনি দেখবেন—

হ্যাঁ, তা ঠিক, তা ঠিক—বলে উঠলেন পাঠমগ্ন ডাঃ ফুরনু। মানে, তাঁকে যা বলা হল, তার বিন্দুমাত্রও কানে গেল বলে মনে হল না।

এই তরুণ বৈজ্ঞানিক অবাক হয়ে গেল ডাঃ ফুরনুর আচরণ দেখে। সে বুঝতে পারল না এত অমায়িক ও মিশুক ডাঃ ফুরনু আজ কী করে, এমন উদাসীন হলেন। যুবকটি তাঁর অফিস ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বারান্দায় এবং একজন সহকর্মীকে দেখে ডেকে বলল—আচ্ছা, ডাঃ ফুরনুর কী হয়েছে বলতে পার? আমি তাঁকে যেন কেমন একটু অন্য রকম দেখলাম, এমন ত কখনো দেখিনি!

অপরজন জিজ্ঞাসা করল—কেন, কেমন মনে হল?

আরে, তিনি যে মুখ তুলে কথাই বলছেন না! কী একটা পড়ছেন আর তাতেই একেবারে তন্ময় হয়ে রয়েছেন!

তাইত! কাউকে অগ্রাহ্য করে কথার উত্তর না দেওয়া, এ ত তাঁর স্বভাবে নেই জানি! তাহলে যা পড়ছেন সেটা নিশ্চয় গুরুতর একটা কিছু হবে।

তারপর তারা যে যার কাজে চলে গেল। কিন্তু উভয়েই ভেবে অবাক হল তাদের পরিচালক দরদী বন্ধু ডাঃ ফুরনুর আজ হল কী!

এদিকে ডাঃ ফুরনু সেই বিবরণী পড়তে পড়তে আপন মনেই বলছেন—বাঃ! এ একটা জিনিস বটে, জিনিস বটে!

এটা আসলে ছিল জার্মানির আই. জি. ফারবেন নামক ওষুধ কোম্পানির নিযুক্ত ডাঃ গারার্ড ডোমাক কর্তৃক লিখিত একটা রিপোর্ট। এতে একটা নতুন ওষুধের বিবরণ লেখা ছিল যা ডাঃ ডোমাক তিন বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন। আর এ ওষুধটা অনেক দিক দিয়ে বেশ কাজের। এই রিপোর্টের বর্ণনানুসারে ওষুধটা যদি ঠিক ঠিক কাজ দেয় তাহলে অনেকগুলি দুরারোগ্য মারাত্মক ব্যাধি আরোগ্য হতে পারবে। এই ওষুধের যদি সত্যি সত্যিই এমন ক্ষমতা থাকে তাহলে চিকিৎসকদের অনেক দিনকার একটা বড় মাথা ঘামানো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

এই সমস্যাটা ডাঃ ফ্লেমিং প্রথম পেনিসিলিন আবিষ্কার করার পূর্বে ঠিক যা ছিল প্রায় তাই, কেননা ডাক্তারদের পেনিসিলিনে তখনো পূর্ণ আস্থা না আসায় এবং পেনিসিলিন উন্নত ও সুসম্পূর্ণ হয়ে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় কেমোথেরাপি চিকিৎসা সংক্রান্ত এমন একটা ওষুধের প্রয়োজন হচ্ছিল যা শরীরাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে জীবাণুধ্বংস করবে। এর অভাবে কতকগুলি সাধারণ মারাত্মক রোগে প্রতি বছর অগনতি মানুষ মারা যাচ্ছিল—তা থেকে বাঁচাবার কোন উপায় ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৩৫

সালে এই কেমোথেরাপি বা রাসায়নিক দ্রব্যের অভ্যন্তরীন সঞ্চারণ চিকিৎসার প্রতি বেশ খানিকটা আগ্রহের সৃষ্টি হল, অবশ্য তার ফলেও পেনিসিলিনের প্রতি মনোযোগ বিশেষ পড়ল না; যদিও এর ছয় বৎসর আগে পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়েছিল। পেনিসিলিনের কথা লোক এক রকম ভুলেই গেছে বলা যায়। কিন্তু এই নতুন ওষুধ প্রোনটসিল এর পিছনে গোড়া থেকে আছে একটা প্রতিপত্তিশালী বড় দরেব ওষুধ কোম্পানি। আর এই প্রোনটসিলেরই বিবরণ পড়ে ফ্রান্সে বসে ডাঃ ফুরনুব সচেতন মন ঔৎসুক্যে একাগ্র হয়ে উঠেছিল।

বিবরণ পড়তে পড়তে ডাঃ ফুরনু বুঝলেন এর বিস্তৃত তথ্যানুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। যদি ডাঃ ডোমাক-এর বিবৃতি অনুযায়ী এ ওষুধটা কাজ দেয়। তাহলে মনুষ্য-জীবন রক্ষার নিমিত্ত শীঘ্রই এর বহুল উৎপাদন আবশ্যক। অবশেষে মনস্থ করলেন তিনি নিজেই এই ওষুধ সম্বন্ধে অবিলম্বে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা আরম্ভ করবেন।

তিনি বিবরণীখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সামনে একজন মেয়ে-কেরানিকে দেখে বললেন,—আচ্ছা, আপনি ডাঃ লোভাদি, ডাঃ ভাইসম্যান, ও ত্রেফুয়েল দম্পতিকে একটু ডেকে দিতে পারেন কি? তাঁদের বলবেন, সম্ভব হলে যেন সোজা আমার অফিস-ঘরে চলে আসেন।

মহিলাটি সেই সংবাদ নিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালানো, আর এদিকে ডাঃ ফুরনু তাঁর ডেস্কে আবার গিয়ে বসলেন, তাঁর মুখ গম্ভীর, চোখ যেন জ্বলছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবাই তার অফিসে এসে হাজির হলেন।

বসুন দয়া করে। আপনাদের বেশ একটা জবর খবর বলবার আছে।

তাঁরা বসলে তিনি সেই বিবরণীটির বিষয় আগাগোড়া তাঁদের শোনালেন। তারপর বললেন—কী অদ্ভুত কাণ্ড দেখুন! এই ওষুধটা ডাঃ ডোমাক তিন বছর হয় আবিষ্কার করেছেন, সেই ১৯৩২ সালে। যদিও এটা মানব জাতির কল্যাণের জন্যে বিশেষ দরকারি তবুও এর উন্নতি ও প্রচার সম্বন্ধে এ যাবৎ কিছুই করা হয়নি। এই আবিষ্কারটা এখন যাদের সম্পত্তি সেই ভেষজ বিভাগের বড়কর্তা হলেন ডাঃ হেনরিক হোয়ার্লিন। আমি তো বুঝতে পারছি না কী কারণে তিনি এর প্রচার চেপে রেখেছেন। যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হবেন, তিনি তাঁর ওষুধ প্রত্যেককে পরীক্ষা করবার সুযোগ দেবেন, অন্যান্য চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের কাছে তাঁর ওষুধ ও তথ্য পরিবেশন করবেন যাতে তাঁরা আরো গবেষণা ও পরীক্ষা করে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় আবিষ্কার করেন, আরো তার উন্নতি করেন, যাতে মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ হয়।

উপস্থিত সকলেরই মনে হল ওষুধটা 'পেটেন্ট' অর্থাৎ স্বত্বাধিকার সুরক্ষিত করার স্বার্থে ডাঃ হোয়ার্লিন এটা বাইরে প্রচারের গরজ করেন নি। ফরাসি আইনানুসারে কোন ওষুধের পেটেণ্ট বা স্বত্ব-সংরক্ষিত হয় না। যে জিনিস মানুষের জীবন বাঁচায়, সেই মহাকল্যাণপ্রদ দ্রব্য গবেষণায় উন্নত করা বা নিজের কারখানায় উৎপাদন করে যে কেউ বিক্রি করতে পারেন। ফরাসি বিজ্ঞানীরা তাদের দেশের এই উদার আইনের জন্যে নিজেরা বেশ গর্ব বোধ করেন।

ডাঃ লোভাদি সাগ্রহে বললেন—তাহলে আপনার কি ইচ্ছে—

এই ওষুধটা সন্ধান করে আমরা এর গুণাগুণ বাজিয়ে দেখব! এই বলে ডাঃ ফুরনু খানিকক্ষণ ব্যাপারটা চিন্তা করে বললেন—আচ্ছা, আই. জি. ফারবেন কোম্পানির হেনরিক হোয়ার্লিন-

এর সঙ্গে আমি পত্রে একটু যোগাযোগ করে দেখি, তাঁদের কাছ থেকে ওষুধের একটু নমুনা পাওয়া যায় কিনা! তারপর তাই নিয়ে আমরা পরীক্ষা শুরু করব। এই রিপোর্ট পড়ে মনে হচ্ছে জার্মানির হাসপাতালে এই ওষুধটার বিশেষ পরীক্ষা হয়নি। আমার মনে হয় আপনারা এই ব্যাপারে নিশ্চয় আমার মতই সমান আগ্রহশীল। আশাকরি এই কাজে আপনারাও কিছুটা সময় নিয়োগ করবেন।

তাঁর কথায় উপস্থিত সকল বিজ্ঞানীই এই কাজের ভার নিতে সম্মতি জানালেন। ডাঃ ফুরনু ডাঃ হোয়ালিনকে পরবর্তী প্রথম ডাকেই একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন।

মতদ্বৈধ

ফরাসি বৈজ্ঞানিকেরা জার্মানি থেকে উত্তর' না আসা পর্যন্ত সময়টা কিন্তু বেশ দরকারি কাজে লাগালেন। ওষুধ সম্পর্কে প্রাপ্ত সমস্ত সংবাদ যত্নসহকারে পাঠ করতে লাগলেন আর এই ওষুধটির আবিষ্কর্তা ডাঃ গারহার্ড ডোমাক-এর কাহিনীও পড়লেন।

তাঁরা দেখলেন, ওষুধটা নীল বা আলকাতরা থেকে উৎপন্ন একরকম রঞ্জক পদার্থ থেকে তৈরি। ডোমাক ছিলেন একজন তীক্ষ্ণধী বিজ্ঞানী। ১৮৯৫ সালে জার্মানির ক্ষুদ্র শহর লেগোতে তাঁর জন্ম হয়। তিনি শান্তশিষ্ট সুশীল বালক ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ঔষধ বিজ্ঞানে তাঁর খুব ঝোঁক পড়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞান বা ঔষধ সংক্রান্ত যে কোন বই পেলেই তিনি পড়ে ফেলতেন, আর শেষে মনে মনে স্থির করলেন কোন মেডিক্যাল-স্কুলে ভর্তি হবেন। কিন্তু সেই সময় প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে গেল। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো। তরুণ ডোমাক অমনি সেনা-বিভাগে নাম লেখালেন!

তখন যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্যে ডাক্তার প্রভৃতির আবশ্যকতা খুবই বেশি, তাই ডোমাক-কে একজন সামরিক চিকিৎসকের সহকারী পদে একটা চাকরি দেওয়া হয়। তাঁর নিজে নিজে শেখা বিদ্যা কিন্তু খুব কাজের হল, দেখা গেল সাধারণ নতুন ডাক্তারদের চেয়ে তিনি অনেক বেশি জানেন আর তাঁর গুণের সমাদরও হল। তাই শীঘ্রই তিনি অন্যান্য পাশকরা ডাক্তারদেরই উপযুক্ত কতকগুলি কাজের দায়িত্ব পেলেন। এভাবে কাজ করতে করতে সহকর্মী অভিজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসকদের কাছ থেকেও জ্ঞান অর্জন করতে লাগলেন। ফলে যুদ্ধের শিবির হাসপাতালই হল তাঁর শিক্ষা-মন্দির।

যুদ্ধ শেষ হলে ডাঃ ডোমাক কীয়েল-বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল-স্কুলে চিকিৎসা-বিদ্যা সুসম্পন্ন করে ডাক্তারের লাইসেন্স নিয়ে রেকথাব ইনস্টিটিউটে ভর্তি হলেন। সেখান থেকে স্নাতকরূপে বেরিয়ে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় ও শিক্ষাদান দুইই করতে লাগলেন, আর অবসর সময়ে ক্যান্সার রোগ সম্বন্ধে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯২৭ সালে বৃহৎ জার্মান প্রতিষ্ঠান আই. জি ফারবেন থেকে হেনরিক হোর্য়ালিন তাঁকে ডেকে পাঠালেন তার ফার্মে গিয়ে যোগ দিতে। বন্ধুরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন কোন প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা-যুক্ত লোকের পক্ষে এটা মস্ত বড় সুযোগ, কারণ সেখানে তিনি জগতের একটা শ্রেষ্ঠ সুসজ্জিত ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সুযোগ পাবেন। তিনিও মনে মনে ভেবে দেখলেন অন্য কোন কিছুর চেয়ে গবেষণাই হচ্ছে তার জীবনের সব চেয়ে প্রিয়। তাই শেষ পর্যন্ত সেই আহ্বান গ্রহণে সম্মত হলেন।

ডাঃ ডোমাক এই কোম্পানির এলবারফিল্ড-এর ল্যাবরেটরিতে

যোগদান করলেন। হয়ত সেখানে গিয়েও তাঁর সেই ক্যান্সার সম্বন্ধে গবেষণাটা চালাবার ইচ্ছাং ছিল, কিন্তু ডাঃ হোয়ার্লিন তাঁকে নির্দেশ দিলেন আলকাতরাজাত রঞ্জক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে, তা থেকে কোন রোগ-আরোগ্যকারী ঔষধ বের করতে পারেন কিনা, তাঁর কোম্পানি যা উৎপাদন করতে পারবে। এই নির্দেশে ডাঃ ডোমাক নিজের আকাংক্ষার বিফলতায় কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেও আর কি করবেন, চাকরি যখন নিয়েছেন নিজের খুশিমত কাজ করলে ত চলবে না! কাজেই নির্দিষ্ট কাজই আরম্ভ করলেন।

একটি উৎকৃষ্ট আধুনিক ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সৌভাগ্য লাভে মনে মনে তিনি বেশ খুশি হয়ে উঠলেন। আর তাঁর ল্যাবরেটরি-সহকারীরাও বেশ বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত। রঞ্জক পদার্থ নিয়ে তিনি নীরবে বেশ কয়েক মাস কাজ করলেন। অবশেষে আলকাতরার রঞ্জক অংশ থেকে একটা দ্রব্য আংশিকভাবে স্বতন্ত্র করে নিতে সমর্থ হলেন। পরীক্ষা করে দেখলেন দ্রব্যটার জীবাণুধ্বংসী ক্ষমতা আছে। প্রথমে এটা টেস্টটিউবে পরীক্ষা করা হল, তারপর জীবন্ত প্রাণীর দেহে। আশ্চর্যের বিষয় এই ওষুধটা টেস্টটিউবে জীবাণু যত না মারতে পারে, জীবন্ত প্রাণীর দেহে সেই জীবাণু মারবার শক্তি এর যেন আরো বেশি। পরীক্ষা করে ডাঃ ডোমাক তাঁর রিপোর্ট লিখে হোয়ালিনের কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন—এই দেখুন, একটা ওষুধ পাওয়া গেছে, এটা আমাদের কোম্পানি তৈরি করে বিক্রি করতে পারবে।

ডাঃ হোয়ার্লিন রিপোর্ট পড়লেন। তিনি নিজেও একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাছাড়া তিনি কোম্পানির কর্মকর্তাদের

অন্যতম হিসাবেও বিচার করে দেখলেন ডাঃ ডোমাক এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন যার প্রচুর বাজার মূল্য আছে।

যদি অন্যান্য ওষুধ উৎপাদক কোম্পানিকেও স্বাধীনভাবে এই ওষুধটা তৈরি করতে দেওয়া হয় তবে অবাধ প্রতিযোগিতায় নিশ্চয়ই তাঁর কোম্পানি সন্তুষ্ট হতে পারবেনা এবং তিনি নিজেও তাতে খুশি হতে পারেন না। তাঁর ইচ্ছা আই. জি. ফারবেন কোম্পানি এই ওষুধে প্রচুর লাভ করবে আর সে জন্যেই ওষুধটা তিনি পেটেন্ট করে স্বত্ব সংরক্ষণ করলেন। তবু তাঁর ভয় হল এই ওষুধের রহস্যের যদি অন্য কেউ হাদিস পায়, তাই এটাকে সাধারণ্যে প্রকাশ করলেন না, এ জন্যেই চিকিৎসকদের গোচরে এই ওষুধের কোন বিবরণ পৌঁছতে দিলেন না। কোম্পানিই গোপনে হাসপাতালে ও কয়েকটি ক্লিনিকে তার পরীক্ষা করে দেখলেন ওষুধটা চমৎকার উতরেছে। যে সব রোগীর কোন আশাই ছিল না এই ওষুধ প্রয়োগে দেখা গেল, কোন ক্ষেত্রে আরোগ্যে সহায়তা করল, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আরোগ্যই সম্পাদন করল।

তারপর ১৯৩৫ সালে ডাঃ ডোমাক-কে নির্দেশ দেওয়া হ ,— হ্যাঁ, এবার তুমি এ ওষুধের একটা তথ্য-বিবরণ বিশদভাবে ছাড়তে পার। আর যে সব হাসপাতালে যে সকল ডাক্তাররা এটা পরীক্ষা করেছেন বা করছেন তাঁদের নামও দিয়ে দিতে পার। ডাঃ ডোমাক যে বিবরণী প্রকাশ করলেন সেইটাই সেদিন ফ্রান্সে পাস্তুর ইনস্টিটিউটে ডাঃ ফুরনু ও তাঁর সহ-বিজ্ঞানীরা আগ্রহের সঙ্গে পড়ছিলেন।

এদিকে কয়েকদিনের মধ্যে ডাঃ হোয়ার্লিন-এর কাছ থেকে চিঠির উত্তর এসে গেল। ঐ জার্মান কোম্পানির কর্মকর্তাটি কিন্তু

ওষুধের নমুনা পাঠানোর কোন উল্লেখই করেননি চিঠিতে। শুধু বলে পাঠালেন, যদি ডাঃ ফুরন্থ আই. জি. ফারবেন কোম্পানির অফিসে এসে স্বয়ং তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফ্রান্সে এই ওষুধটার প্রচলন সম্পর্কে আলোচনা করেন তবে তিনি খুশি হবেন।

ডাঃ ফুরন্থ তখনই তল্পি-তল্পা বেঁধে যাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে আলোচনা করে তিনি ও ডাঃ হোয়ার্লিন একমত হতে পারলেন না, কেননা—ডাঃ হোয়ার্লিন ওষুধটার ব্যবসায় ও লাভের দিকেই দৃষ্টি দিলেন আর ডাঃ ফুরন্থ তার মানব-কল্যাণের দিক, মনুষ্য-জীবন রক্ষার দিকে বেশি দৃষ্টি দিলেন। এই বিপরীত দৃষ্টি-ভঙ্গীতে মত-দ্বৈধ না হয়ে পারে না।

ডাঃ হোয়ার্লিন স্পষ্টই জানালেন, ডাঃ ফুরন্থ যতক্ষণ না আই. জি. ফারবেন কোম্পানির স্বার্থে ওষুধটা ফ্রান্সে চালু করবার এক ব্যবসায়-সর্তে সম্মত হচ্ছেন তিনি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করবার জন্যে ওষুধের এক ফোঁটা নমুনাও পেতে পারেন না।

ডাঃ ফুরন্থ তাঁর ভাবগতিক দেখে ভীষণ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর মতে জগতের বড় বড় ঔষধ আবিষ্কর্তারা তাঁদের গবেষণা ও আবিষ্কার বিষয়ে মানবজাতির উপকারের দিকটার চিন্তাই সবার আগে স্থান দিয়েছেন। এই তো কুরীদম্পতি, পাস্তুর, লিস্টার, কক্, আর্লিক আরো কত সব মনীষী রয়েছেন, যাঁরা গত একশত বছর ধরে ওষুধ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তাঁদের কেউ তো ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাঁদের আবিষ্কারের ব্যবহার-ক্ষমতা দাবিয়ে রাখতে চাননি! তাঁরা প্রত্যেকেই মহৎ-হৃদয় ছিলেন। কিন্তু এই আই. জি. ফারবেন কোম্পানি ও ডাঃ হোয়ার্লিন যতক্ষণ না প্রতি দেশে এই ওষুধ বিক্রির লভ্যাংশের

প্রতিটি কপর্দক আদায় না করতে পারছেন ততক্ষণ মানব জাতিকে এ ওষুধ থেকে বঞ্চিত রাখতে চাচ্ছেন।

ডাঃ ফুরনু প্রোনটসিল ওষুধের নমুনা না নিয়েই প্যারিতে ফিরে এলেন। পথে রেলগাড়িতে বসে ভাববার তিনি যথেষ্ট অবকাশ পেলেন এবং অতঃপর কী করবেন তার একটা পরিকল্পনাও মনে মনে স্থির করলেন।

এগিয়ে যাওয়ার সঙ্কেত

পরদিন সকালেই ডাঃ ফুরনু প্যারিতে তাঁর অফিসে ফিরে এলেন। এখানে তিনি ও তাঁর গোষ্ঠীর বিজ্ঞানীরা— যেমন, ডাঃ লোভাদি, ডাঃ ভাইসম্যান, ত্রেফুয়েল দম্পতি ও আরো অনেকে একটা বৈঠকে বসলেন। ডাঃ ফুরনু আই. জি. ফারবেন-এর ডাঃ হৌয়ার্লিন-এঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ সব খুলে বললেন। তিনি বললেন—

দেখুন, এটা পরিষ্কার বোঝা গেল ডাঃ হোয়ার্লিন-এর কাছ থেকে পরীক্ষা করার মত প্রেনটসিলের নমুনা এক বিন্দুও মিলবে না।

অমনি একজন বলে উঠলেন—তাহলে আমরা কি নিজেরাই ও জিনিসটা তৈরি করে নেব!

নিশ্চয়ই! বলে উঠলেন ডাঃ ফুরনু—তাই আমাদের করতে হবে!

প্রোনটসিল একটা রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ। আর ওষুধটা পেটেণ্ট করার অনুমতি নেওয়ার জন্যে আই. জি. ফারবেন কোম্পানিকে ওর উপাদানগুলির বর্ণনা দিতে হয়েছিল। এই বিবরণ পড়ে এবং নিজেরা নানারকম রাসায়নিক সংমিশ্রণের পরীক্ষা

চালিয়ে যে কোন দক্ষ বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ওষুধটি তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। তাই এইভাবেই ল্যাবরেটরিতে কাজ শুরু করা হল।

এখন হল কি, ডাঃ গিরার্দ নামে আর একজন ফরাসি বৈজ্ঞানিক সংকেত ধরে কাজ করে প্রথম প্রোনটসিল তৈরি করে ফেললেন। পাস্তর ইনস্টিটিউটে ডাঃ লোভাদি কতিপয় রোগাক্রান্ত জন্তুর ওপর তার পরীক্ষা চালালেন এবং দেখলেন এর মত জীবাণু নাশে অমোঘ ওষুধ আর দ্বিতীয় নেই।

ডাঃ ফুরনু অসাধারণ মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে পরীক্ষাগুলি দেখতে লাগলেন। তিনি ক্লদ বার্নার্ড হাসপাতালের একদল ডাক্তারকে ডাকলেন আর আরোগ্যের অতীত রোগীদের ওপর এই নতুন ওষুধ প্রয়োগ-কার্যে সহায়তা করতে অনুরোধ জানালেন—যদি এতে কোন রোগীকে বাঁচানো যায়! এ ওষুধটা আগে জার্মানিতেও সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষায় উতরেছে। কাজেই এ পরীক্ষা খুব যে বিপজ্জনক তা নয়। ফরাসি হাসপাতালের ডাক্তাররা ভীষণভাবে স্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণুতে আক্রান্ত রোগীদের ওপর প্রয়োগ করলেন এবং আশাতীত ভাল ফলই লাভ করলেন।

ইতিমধ্যে ত্রেফুয়েল দম্পতি গবেষণাগারে ওষুধটি বিশদ-ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁরা দেখলেন প্রোনটসিল-এর একটা অংশ একেবারে অকেজো, আর একটি অংশই হল জীবাণু-নাশক। সুতরাং ওষুধের যে অংশটা অকেজো এবং ওষুধে একটা লালচে ভাব এনে দেয় সেটা বাদ দিয়ে বর্ণহীন বিশুদ্ধ ওষুধ তৈরিতে মনোযোগ দিলেন। এই যে ওষুধ অংশ এটা সালফা-নিলামাইড নামধেয় একটি জ্ঞাত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ। জার্মানরা

এই অংশ সম্বন্ধে এতদিনে এইটুকু শুধু জানতে পেরেছিল যে এই বিদিত যৌগিক পদার্থটা রোগ জীবাণুর শত্রু।

ডাঃ ফুরনু জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, সালফানিলামাইড—যা আগে জার্মানদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে তার 'পেটেণ্ট' স্বত্বটা কার দেখেছ কি ?

ত্রেফুয়েল-দম্পতি তা জানতেন। এই যৌগিক দ্রব্যটা প্রথমে তৈরি করেন ডাঃ পি. গেলমো নামে একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক ১৯০৮ সালে। ১৯১৭ সাল নাগাদ আরো কয়েকজন জার্মান বৈজ্ঞানিক এ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। তারপর হেনরিক হোযালিন তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক-জীবনে এটা পুনরাবিষ্কার করেন ও নিজের নামে পেটেণ্ট করে নেন। কিন্তু তিনিও তখন এটাকে জীবাণু-নাশক রূপে জানতেন না—ওষুধের এই দিকটার কোন পরীক্ষাও তিনি করেননি। তারপর মেয়াদ অন্তে নূতন করে পেটেণ্ট-অধিকার নেন নি। ফলে তাঁর সে অধিকারটা তামাদি হয়ে যায়। ভালই হল! স্বত্বাধিকারের দাবি যদি কারো থাকে তিনি ডাঃ গেলমো, যিনি প্রথম সালফানি-লামাইড আবিষ্কার করেন।

এসব বৃত্তান্ত শুনে ডাঃ ফুরনু প্রাণখুলে বেশ একটু হেসে নিলেন। কেননা ঐ রূঢ় ও চতুর ডাঃ হোয়ালিনকে তাঁর মোটেই পছন্দ হয়নি। তিনি বললেন, হোয়ালিন এই ওষুধের অধিকার এখন হাতছাড়া হচ্ছে দেখে নিশ্চয় খুব ক্ষেপে যাবে!

ফরাসি বৈজ্ঞানিকদের কাছে এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল কেন আই. জি. ফারবেন কোম্পানি প্রোনটসিলের সংকেতে ঐ অকেজো লাল রঞ্জক পদার্থের ভাগটা রেখেছিল। সেই সালফানিলামাইড থেকে তাদের ওষুধের কিছু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে—যাতে

তারা এটাকে একটা নতুন ওষুধ বলে পেটেণ্ট করে নিতে পারে।

এই সব নানা রহস্য বের করে ফরাসি বৈজ্ঞানিকরা বেশ খুশি হলেন। এখন সালফানিলামাইড যে কোন দেশে যে কেউ অবাধে তৈরি করতে পারবে। আই. জি. ফারবেন কোম্পানি অপ্রযোজনীয় নিষ্ক্রিয় লাল রঞ্জক পদার্থওয়ালা প্রোনটসিল ওষুধটা যত খুশি বিক্রি করুক না! ফরাসিরা তার শুদ্ধ ঔষধাংশ সালফানিলামাইড মনের আনন্দে তৈরি করবে।

আর একটা সুবিধা হল এই নতুন সালফা ওষুধটা প্রোনটসিল তৈরি করার চেয়ে ঢের সহজ—উৎপাদকদের খুব কম হাঙ্গামা পোযাতে হয়। এবার সস্তায় ও অবিলম্বে হাসপাতাল বা বাইরের সকল রোগীরাই এ ওষুধ পেতে পারবে। সালফা ওষুধগুলিব এই সহজ তৈরির সুযোগ থাকার জন্যই এগুলি পেনিসিলিনের অনেক আগেই ডাক্তারদের ব্যবহারে চালু হতে পেরেছে; আর খুব সূক্ষ্ম ও জটিল পদার্থ ছত্রক থেকে পেনিসিলিন তাডাতাড়ি সহজে স্বতন্ত্র করে ফেলা বেশ কঠিন কাজ।

এর পরে লণ্ডনের কুইন শার্লট হাসপাতালে ইংরাজ বৈজ্ঞানিকরা প্রোনটসিল প্রযোগ পরীক্ষা করলেন। পঁযষট্টিজন মারাত্মক বোগাক্রান্ত রমণীর মধ্যে একষট্টিজন এ ওষুধে সেরে উঠল। ১৯৩৬ সনের গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাইক্রো-বাযোলজি (অণুবীক্ষণ-গ্রাহ্য জীববিদ্যা) কংগ্রেসে ইউরোপ, এশিযা ও আমেরিকা থেকে সমাগত বহু বৈজ্ঞানিকদের সামনে উপরোক্ত পরীক্ষার ফল পঠিত হল।

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালযের ডাঃ পেরিন লঙ ও ডাঃ এলিনব ব্লিস নামক দুজন আমেরিকার বৈজ্ঞানিক এই বিষয়ে অত্যন্ত

আগ্রহ-প্রকাশ করলেন। তাঁরা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে এই ওষুধ নিয়ে আলোচনা ও এই সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করলেন। ডাঃ লঙ বললেন—আমরা এ জিনিসটার গবেষণা ও পরীক্ষা না করে ছাড়ছিনা।

নিশ্চয়ই না—বললেন ডাঃ ব্লিস! এর প্রয়োজন যে বড়ই গুরুতর।

যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণ

কয়েক সপ্তাহ পরে ডাঃ লঙ ও ডাঃ ব্লিস যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে ওষুধ উৎপাদকদের প্রোনটসিল অথবা সালফানিলামাইডের নমুনা পাঠাতে .পত্র লিখলেন, তাঁরা ঐ জিনিসটা নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে চান।

প্রথমে ওষুধ কোম্পানিরা বলে পাঠাল আপাতত তাদের হাতে এ-জাতীয় কোন ওষুধ নেই। অবশেষে একটি কোম্পানি অল্প পরিমাণ সালফানিলামাইড পাঠিয়ে দিল। এই নিয়ে ঐ বৈজ্ঞানিক দুজন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে ও হাসপাতালে পরীক্ষা শুরু করে দিলেন। তাঁরা দেখলেন এ ওষুধে কতকগুলি সাংঘাতিক ব্যাধি সারছে বটে কিন্তু কতকগুলি রোগে আদৌ কার্যকরী হচ্ছে না। আরো দেখলেন এতে কিছু পরিমাণ দোষও আছে, অর্থাৎ বিষিত গুণ আছে এবং প্রতিক্রিয়ায় কতকগুলি আলাদা রোগের সৃষ্টি হতে পারে। তখন এমন উপায় খুঁজতে লাগলেন যা দিয়ে ওষুধের ঐ দোষগুলি যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা যায়। তাঁরা আরো লক্ষ করলেন, ব্যাধি যদি দুর্দান্ত হয় ।এবং অনেকদিন ধরে বা বেশি পরিমাণে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয় তখন কোন কোন ক্ষেত্রে মনুষ্য শরীর প্রতিরোধ (resistance) শক্তি গড়ে তোলে; তখন আর ওষুধটা খাটেনা। এসব দেখেও কিন্তু তাঁরা নিরুৎসাহ হলেন না, তাঁরা বুঝেছিলেন সালফা-ওষুধকে যে সর্বরোগেরই ধন্বন্তরি হতে হবে তার কোন মানে নেই। তাছাড়া অনেক রোগীর জীবন বাঁচাতে ওষুধটা খুবই কার্যকরী হবে সন্দেহ নাই।

তারপর ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে ডাঃ লঙ হোয়াইট হাউস থেকে মিসেস এলিনর রুজভেল্টের কাছ থেকে এক টেলিফোন পেলেন। ফোনে লেডি রুজভেল্ট জানালেন তাঁর পুত্র ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের গলায় ভয়ানক স্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণুর সংক্রমণ হয়েছে আর তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসক বলছেন অবস্থাটা বেশ বিপজ্জনক।

রুজভেল্ট-গৃহিণী জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, নতুন সালফা ওষুধটা প্রযোগ করে দেখলে কেমন হয়?

ডাঃ ল[illegible] [illegible]লেন, তাঁ[illegible] যতদূর বিশ্বাস এ ওষুধে রোগটা সারবেই এবং অবিলম্বে বালকের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর সালফানিলামাইডের চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। ফলে বালক রুজভেল্টের ত্বরিত আ[illegible]রোগ্যের লক্ষণ দেখা যেতে লাগল ও শীঘ্রই সে রোগ-মুক্ত হয়ে উঠল।

এ খবরটা খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরের শিরোনামা দিয়ে বের হল। কেননা যে আরোগ্য হয়েছে সে শুধু প্রেসিডেন্টের পুত্রই নয়, লক্ষ লক্ষ আমেরিকান নরনারীর প্রিয় যে রুজ[illegible]ল্ট পরিবার এ তাঁদেরই একজন। সবাই তরুণ ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভে[illegible] সেরে ওঠার খবর পড়ে আনন্দ করতে লাগল। এইভাবে সারাদেশ জেনে গেল জীবন বাঁচাতে সক্ষম একটা নতুন ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে আর সেটা প্রয়োগ করে তার ফলও হাতে হাতে পাওয়া গেছে। যারা এই নতুন ওষুধ প্রয়োগ করতে ভয় পেয়েছিল তাদের সে ভয়টাও ভেঙে গেল।

দেশের সমস্ত অঞ্চলের চিকিৎসকরাই তখন সালফা ওষুধের উপকার ও গুণাগুণের বিবরণ পাঠ করে দেখতে লাগলেন। আর কী ভাবে এটা প্রয়োগ করে চিকিৎসা করতে হয় তাও পড়লেন।

ওষুধ-উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলিও এই ওষুধ প্রস্তুত করবার নির্দেশ পেল আর তারা তৈরি করতে লেগেও গেল।

জন হপকিন্স হাসপাতালে ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বড় বড় দাতব্য চিকিৎসালয়ে এই ওষুধের পরীক্ষা চলতে থাকল—কেননা এই ওষুধ সম্বন্ধে আরো অনেক-কিছু ভাল করে অনুধাবন করবার ছিল। ডাক্তাররা বুঝেছিলেন ওষুধের উৎকৃষ্টতম বিজ্ঞান-সম্মত প্রয়োগ পদ্ধতি আবিষ্কার করা চাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রোগীর দেহে এ ওষুধের ক্রিয়া কিরূপ হয় তাও তাঁদের লক্ষ করা কর্তব্য। এ ওষুধ কোথাও কোনরূপ অসুবিধা বা বিভ্রাট সৃষ্টিকরিতে পারে তাও জানা প্রয়োজন এবং সে বিপদ কাটাবার উপায় জানাও দরকার। তাছাড়া, ন্যূনতম কত পরিমাণ ওষুধের প্রযোগে রোগ সারতে পারে এও জানতে হবে, তাহলে তাঁরা অল্প মাত্রা ব্যবহারে অনুরূপ অল্প পরিমাণ প্রতিক্রিয়ায় রোগটা তাড়াতাড়ি সারাতে পারবেন।

১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দেখা গেল এটা তখনো নতুন ওষুধরূপে চলছে, কিন্তু এই ওষুধ কাজ দিল অদ্ভুত। এই মূল্যবান মহৌষধ কুড়ি হাজার লোকের জীবন বাঁচিয়ে এক উল্লেখযোগ্য রেকর্ড স্থাপন করল এবং ক্রমশ আরো লোকের জীবন বাঁচিযে চলল। তারপর আবার বৈজ্ঞানিকরা সালফা ওষুধ নতুন নানা পদ্ধতিতে তৈরি করতে মন দিলেন যাতে বিভিন্ন প্রকারের রোগ, আঘাত ও ক্ষত সারানো যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে দেখা গেল সালফা ওষুধ জীবন রক্ষায় অস্বাভাবিক কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। প্রথমে এর ব্যবহার হল ইউরোপে। তারপর ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর ফ্যাসিস্টতন্ত্রী জাপান কোন যুদ্ধ ঘোষণা না করেই পার্ল হারবারে আমেরিকান জাহাজ ও সামরিক ঘাঁটিগুলি বোমা বিধ্বস্ত করল। নশো-ষাটজন

সৈনিক, নাবিক, কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিক গুরুতররূপে আহত হল। সৌভাগ্যক্রমে সামরিক চিকিৎসা বিভাগ আগে থাকতেই তাদের যুদ্ধ-বিভাগ থেকে হুঁসিয়ারি শুনেছিল এবং সেই অনুযায়ী সালফা-ওষুধ নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিল, তাই রক্ষা! এই সময় যদি সালফা-ওষুধ না থাকত তা[illegible]লে সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসকরা [illegible]বন বাঁচিয়ে ছিলেন, আপ্রাণ চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারতে[illegible] হয়ত আহত ও দগ্ধ ব্যক্তিদের অনেকে শুধু রক্ত-দুষ্টিতে [illegible] পড়ত।

এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন অংশে মহাযুদ্ধ তাণ্ডব লীলা শুরু করতেই প্রত্যেক সৈনিক সঙ্গে খানিকটা করে সালফা ওষুধ রাখত। কোন প্রকারে যদি আহত বা কোন প্রকারে চোট লাগত অমনি তাড়া[illegible]ড়ি খানিকটা ঐ সালফা ওষুধের গুঁড়ো ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিত। এইভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষাক্ত হওয়া বা রক্তদুষ্টি ঘটার সম্ভাবনা আগে থাকতে নিবারণ করা গিয়েছিল।

সত্যি, ক্ষতের প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে সালফা ওষুধ ব্যবহার করা হত বলেই তাড়াতাড়ি ক্ষত-দুষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকত ' আর সেজন্যে বড় বড় আঘাত বা ক্ষতের চিকিৎসা যুদ্ধ ঘাঁটির সরঞ্জামহীন হাসপাতালে করতে হত না, রোগীকে নিশ্চিন্তভাবে অন্যত্র ভাল হাসপাতালে উৎকৃষ্টতর চিকিৎসার জন্য পাঠানো চলত। নিউমোনিয়া, মেনিঞ্জাইটিস প্রভৃতি কতকগুলি রোগ এই শ্রেণীর ওষুধে সহজেই বেশ সারানো যেত। তারপর যুদ্ধের শেষ দুই-আড়াই বছর সালফা ওষুধের চেয়ে কম বিষাক্ত ও বেশি কার্যকরী পেনিসিলিন ওষুধ যুদ্ধাহতরা ব্যবহার করতে পেল। যে মারাত্মক অবস্থায় সালফা ওষুধ আর কাজের হতনা সেখানে এই পেনিসিলিন

জীবন রক্ষা করতে লাগল, অনেক রোগ সম্পূর্ণরূপেই আরোগ্য করে দিল।

এর পর সালফা ওষুধের উন্নততর অধিক কার্যকরী প্রয়োগ-পদ্ধতিও আবিষ্কার হয়েছে। পেনিসিলিন, অরিওমাইসিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন ও অন্যান্য মূল্যবান বীজাণুনাশক (অণুবীক্ষণ গ্রাহ্য ছত্রক বা জীবাণু দেহ নিঃসৃত নির্যাসে প্রস্তুত ভেষজ) ওষুধের আজকাল খুব ব্যবহার করা হয়, এসব প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও সালফা-ওষুধগুলির প্রয়োজন এখনো কিছুমাত্র কমেনি। এ ওষুধের প্রচলন এত বেড়েছে যে ১৯৫০ সালেই সত্তর লক্ষ পাউণ্ড তৈরি হয়েছে। এর উপযোগিতা যে কত বেশি তা আমাদের ধারণার অতীত।

এ যুগের নতুন জীবাণু-নাশক

যার কথা ভেবে আকুল

ছোট্ট শহরে একটি অতি পরিচিত দোকানের সামনে একদল হাইস্কুলের ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়েছিল। সবাই নীরব, মুখ বিষাদ-মলিন। জটলা করে কিছু কিনতে তারা আসেনি—নেহাত অভ্যাস বশেই জড় হয়েছে। এইমাত্র তারা খবর পেয়েছে তাদের ইস্কুলের 'স্যালি' নামে একটি মেয়ের ক্ষয়-রোগ হয়েছে যার জন্যে সে কয়েক সপ্তাহ যাবত আর ইস্কুলে আসছে না।

কী ভয়ানক! একটি মেয়ে বলে উঠল—বেচারি স্যালি!

একটি ছেলে বলল, ডাক্তাররা বলছেন ওর রোগটা নাকি খুবই মারাত্মক। একে বলে মিলিযারি টিউবারকিউলোসিস—

সে আবার কী! প্রশ্ন করল আর একটি মেয়ে।

তা আমি এত জানিনা ছেলেটি উত্তর দিল। শুধু জানি এটা এটা খুব খারাপ জাতের রোগ—মৃত্যু অবধারিত।

কী ভয়ানক! বলল প্রথম মেয়েটি।

সেখানে দাঁড়িয়ে তারা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল; মুখে ব্যথা ও বেদনার অবর্ণনীয় প্রকাশ।

একখানা গাড়ি এসে থামল। ভেতর থেকে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ছোট একটি কালো ব্যাগ হাতে করে বেরিয়ে এলেন। ইনি এই শহরের ডাক্তার। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দোকানে গিয়ে ঢুকলেন। একটি ছেলে সুযোগ বুঝে জিজ্ঞাসা করল—ডাক্তার বাবু, 'স্যালি' কেমন আছে? তাকে কি বাঁচানো যাবে না?

ডাক্তার গম্ভীর মুখে একবার তার দিকে, তারপর অন্য সবার দিকে চেয়ে বললেন—আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের সৌভাগ্য আমরা আজ ১৯৪৮ সালে বাস করছি। ওর রোগটা যে ধরনের তার কোন ওষুধ দু-এক বছর আগেও ছিলনা। কাজেই ওরকম রোগ হলে তখন বড় একটা কেউ বাঁচত কিনা সন্দেহ। কিন্তু আজ-কাল এর একটা উপায় আছে। 'স্ট্রেপ্টোমাইসিন' নামে একটি নতুন ওষুধ সম্প্রতি বের হয়েছে। এই ওষুধ হয়ত তোমাদের 'স্যালি'কে সারাতে পারে; আমরা ওকে এখন এইটিই দিচ্ছি। তবে এ ওষুধও যাদের যাদের দিয়েছি সবাই সেরে উঠেছে তা নয়, কিন্তু এতে অনেকে উপকার পেয়েছে।

একটি মেয়ে বলে উঠল—হ্যাঁ, সত্যি স্যালি আবার ভাল হবে! ডাক্তার বললেন—তার সম্ভাবনা আছে। আমরা আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের স্বর্ণ-যুগে বাস করছি। এটা পেনিসিলিন, সালফা-ওষুধ, স্ট্রেপ্টোমাইসিনের যুগ।

ডাক্তার তাঁর কাঁচা-পাকা চুলে একবার হাত বুলিয়েই যেন চিন্তায় ডুবে গেছেন তারপর বললেন—স্ট্রেপ্টোমাইসিন ওষুধটা নতুন, আর একে ঠিক ব্যবহারোপযোগী করে আনতে এখনো বহুবৎসর লাগবে। এখনো এর কতকগুলি খারাপ প্রতিক্রিয়ামূলক দোষ আছে। তবে বিভিন্ন রোগীর ওপর প্রয়োগ করে এর প্রয়োগ-পদ্ধতির জ্ঞান বাড়ানো হচ্ছে আর দোষগুলিও সারাবার চেষ্টা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এর মূল্য অনেকটা বোঝা যাচ্ছে। মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রথম যক্ষ্মা রোগের একটা কার্যকরী অস্ত্র পাওয়া গেছে। এ এমন একটি রাসায়নিক দ্রব্য যা শরীরের ভেতর ঢুকে যক্ষ্মার জীবাণুকে জব্দ করবে। স্যালি সেরে উঠতে পারে!

নতুন আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাই এইবার অতি উৎসাহে কথাবার্তা

বলতে শুরু করল। তারপর ডাক্তার নিজের কাজে মন দিলে জটলা ভেঙে সবাই সরে পড়ল। কিছুদিন পরেই হাসপাতাল থেকে শুভ সংবাদ এল। স্ট্রেপ্টোমাইসিন চিকিৎসায় স্যালির আশ্চর্যজনক উন্নতি দেখা যাচ্ছে। আরো কয়েক সপ্তাহ পরে সংবাদ এল স্যালির জীবনের ভয় কেটে গেছে, তবে সে এখনো খুব রুগ্ন ও দুর্বল। পাঁচমাস পরে সে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরল। অবশ্য খুব সহজে সারেনি, ডাক্তাররা তখনো লক্ষ করেছিলেন রোগের পুনরাক্রমণ হচ্ছে কিনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যিই সে মারাত্মক যক্ষ্মারোগের আক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে উঠল—ইতিপূর্বে এ রোগ বড় একটা সারতে দেখা যায়নি।

স্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কারে শুধু যে স্যালির আত্মীয়-বন্ধু এবং ডাক্তাররাই খুশি হয়েছেন তা নয়, সারা বিশ্বেরই আনন্দিত হবার কথা। কিন্তু কোথায় এ ওষুধটার সন্ধান পাওয়া গেল ? আর কেই বা এটা আবিষ্কার করল ?

রাটজার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউ জার্সি কৃষি-গবেষণা বিভাগে ডাঃ সেলম্যান এ ওয়াক্সম্যান ও তাঁর সহকর্মীদের বহুবছরের সাধনার ভিত্তিতে স্ট্রেপ্টোমাইসিনের জন্ম। ডাঃ ওয়াক্সম্যান রাশিয়ায় জন্মেছিলেন এবং শৈশবে আমেরিকায় চলে আসেন। রাটজার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদশায়ই তাঁর মৃৎ-রসায়ন (soil chemistry) ও জীবাণুতত্ত্বে বিশেষ আগ্রহ ও মনোযোগ দেখা গিয়েছিল। ১৯১৫ সালে স্নাতক হয়ে বেরিয়ে এসে নিউ জার্সি কৃষি-গবেষণা কেন্দ্রে মৃৎ-রসায়ন বিভাগে চাকরি পেলেন।

সেখানে তিনি ও আর. ই. কার্টিস নামে অপর একজন বৈজ্ঞানিক কয়েক শ্রেণীর মৃত্তিকাজাত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবদেহের পরীক্ষা করে দেখলেন সেগুলি ছত্রক ও জীবাণুর মাঝামাঝি একশ্রেণীর

পদার্থ। ঐ থেকে বীজাণুধ্বংসী কোন ওষুধ বের করা যায় কিনা তখনো সেদিক থেকে পরীক্ষা করা হয়নি। কৃষির উন্নতি কী করে সম্ভব এই ছিল গবেষণার বিষয়। কিন্তু ডাঃ ওয়াক্সম্যান স্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কার করবার আগে রেনি তুবো নাম জনৈক ফরাসি বিজ্ঞানী কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন, যার প্রভাব ডাঃ ওয়াক্সম্যান ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের ওপর পড়ে।

অপূর্ব চিন্তা

রেনি দুবো ফরাসি দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। ডাঃ ওয়াক্সম্যানের অধীনে রাটজার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন এবং এক সঙ্গে গবেষণাগারে কাজ করতেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে-সব জীবাণু কাঠ, পাতা, ঘাস ইত্যাদির পচন-ক্রিয়ার কা... ...দের ওপর পরীক্ষা করতে। আর এই কাজের জন্যেই তিনি 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন।

১৯২৭ সালে ডাঃ দুবোকে রকফেলার ইনস্টিটিউটে ডাঃ আভোর সঙ্গে গবেষণা করতে আমন্ত্রণ করা হয়। তাঁদের এমন কোন রাসায়নিক দ্রব্য অথবা জীবাণু আবিষ্কার করতে বলা হয় যা নিউমোনিয়া বীজাণুর কঠিন আবরণটি ক্ষয় করবে। এই দুর্ভেদ্য আবরণটির জন্যেই নিউমোনিয়ার জীবাণুগুলি অবিনাশী হয়ে আছে—তখনকার দিনে এই ধারণাই ছিল।

ডাঃ দুবো গভীরভাবে কাজে ডুব দিলেন। আর ইতিম...য তিনি যখন এই সমস্যা ও এই সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ত তখন নিউ জার্সিতে ডাঃ ওয়াক্সম্যানও এমনি একটা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনিও এমন একটা রাসায়নিক পদার্থ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছিলেন যা যক্ষ্মারোগের জীবাণুগুলির কঠিন আবরণ ক্ষয় করতে পারে। কিন্তু এ কাজে তিনি বেশিদূর এগোতে পারেননি। কেননা তাঁর প্রধান কাজই ছিল কৃষিকার্যে উন্নতির জন্যে মাটির গবেষণা। অবশ্য রকফেলার ইনস্টিটিউটে ভেষজ গবেষণা...ত তাঁর ভূতপূর্ব ছাত্র ডাঃ দুবোর গবেষণার ব্যাপারে আগ্রহশীল ছিলেন এবং তাঁদের

যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। নিউমোনিয়া বীজাণুর আবরণ বিনাশক জীবাণুর অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডাঃ ডুবো ভূমিজ জীবাণুর বিষয় পর্যালোচনা করে দেখলেন। নাঃ, কোনটি দিয়েই তাঁর অভিপ্সিত কার্যোদ্ধার হচ্ছে না। শেষে তাঁর মাথায় এক মজার খেয়াল চাপল। তিনি ভাবলেন জীবাণুগুলি যে ধরণের খাদ্যে জীবন ধারণ করতে অভ্যস্ত সে খাদ্যের যদি পরিবর্তন করা হয় তবে কতকগুলি জীবাণু নতুন খাদ্য আত্মস্থ করতে না পেরে উপোস করে মরে যাবে, কিন্তু কতকগুলি নিশ্চয়ই নতুন খাবার খেয়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করবে। তাঁর মনে হল এই উপায়েই জীবাণুর ভেতর পরিবর্তন আনা যেতে পারে এবং এইভাবে তাদের অন্য খাদ্য খেতে বাধ্য করলে তারা নিউমোনিয়ার জীবাণুগুলিকেই খাবার জন্যে আক্রমণ করবে এবং শুধু এক-আধবার করেই ক্ষান্ত হবে না, চিরকালই ঐ রকম করতে অভ্যস্ত হবে।

কয়েকটি জলের গ্লাসে জীবাণু সমেত মাটি দিয়ে ভর্তি করলেন আর মুখগুলি ঢেকে দিলেন, যাতে বাইরে থেকে নতুন ধরণের কোন জীবাণুই তার মধ্যে ঢুকতে না পারে। এরপর যতদিন পর্যন্ত না জীবাণুগুলি মাটি থেকে স্বাভাবিক খাদ্য শেষ করল তিনি অপেক্ষা করলেন। তারপর প্রত্যেক গ্লাসে নিউমোনিয়া জীবাণুর মিশ্রণ ঢেলে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কয়েক দিন পরে তিনি সেই গ্লাসের ভেতরকার জীবাণুগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন অধিকাংশই খাদ্য অভাবে মরে গেছে, কেননা তাদের নিউমোনিয়ার জীবাণুকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা পোষায়নি। কিন্তু কতকগুলি জীবাণু তিনি যেমন আশা করেছিলেন ঐ নতুন খাদ্য অর্থাৎ নিউমোনিয়ার জীবাণুই খেতে শিখে গেছে আর তার ফলে তারা দিব্যি বেঁচে আছে।

এইবার ডাঃ ডুবো জীবিত জীবাণুপূর্ণ গ্লাস-কয়টি তুলে নিলেন এবং নিউমোনিয়া জীবাণু খেয়ে যাতে বেঁচে থাকতে পারে শিক্ষা দিতে লাগলেন। এই নতুন জীবাণুগুলির জারকরস থেকে তিনি অবশেষে একটা রাসায়নিক পদার্থও বের করতে সমর্থ হলেন। পরীক্ষা করে দেখলেন এই পদার্থ ইঁদুরের দেহের নিউমোনিয়া জীবাণু ধ্বংস করতে পারে বটে, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার জন্যে মানুষের দেহে প্রয়োগ করার ঠিক উপযুক্ত নয়। তাহোক, তিনি হতাশ হলেন না। বিজ্ঞানীরা এত সহজে নিরাশ হন না। অবশেষে ১৯৩৯ তিনি টাইরোথিসিন ও গ্রামিসিডিন নামে দুইটি ওষুধ আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন। টাইরোথিসিন নিউমোনিয়া বীজাণু ধ্বংস করিতে সক্ষম। আসলে এটি একটি তীব্র রাসায়নিক পদার্থ, রোগীর দেহাভ্যন্তরে প্রয়োগ করা নিরাপদ নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে রক্তের লোহিত কণিকাগুলি এতে নষ্ট হয়ে যায়। যাহোক এর গুণও কম নয়। ঘা এবং অন্যান্য চর্মরোগে এর বাহ্য প্রয়োগ খুবই কার্যকরী। যে সব ক্ষেত্রে হয়ত পচ ধরার সম্ভাবনায় দুষ্ট হাত বা পা কেটে বাদ দেওযার কথা সেখানে টাইরোথিসিন ব্যবহার করে দেখা গেছে এতে বিষানো বা ক্ষতদুষ্টি নিবারিত হয়ে ক্ষত সেরে যায়। চর্মরোগ নিরাময হয় পরীক্ষা করে দেখা গেছে। এমনি বাহ্য প্রয়োগে গ্রামিসিডিনও বিশেষ উপকারী। ডাঃ ডুবো এই রাসায়নিক পদার্থের ওষুধগুলি মৃত্তিকার জীবাণু থেকে যখন তৈরি করলেন তার দশ বছর আগে পেনিসিলিন আবিষ্কার হলেও তখনো ব্যবহারের মত সুলভ বা উপযুক্তভাবে উৎপন্ন হত না। ডাঃ ডুবোর আবিষ্কার কিন্তু পেনিসিলিনের ভবিষ্যত কিছুটা গড়ে দিল। যখন ডাঃ ফ্লোরি ও তাঁর অক্সফোর্ডের সহ-বিজ্ঞানীরা পেনিসিলিনের উন্নতি বিধানের ভার নিলেন তখন তাঁদের আর্থিক সহায়তা লাভের প্রয়োজন ছিল,

আর সে সহায়তা করল রকফেলার ইনস্টিটিউট, যেখানে ডাঃ দুবো গবেষণা করছিলেন। তিনি এঁদের সাহায্য করতে তৈরি ছিলেন। রকফেলার ইনস্টিটিউটের পেছনে ছিল ডাঃ দুবোর অত্যদ্ভুত গবেষণালব্ধ জ্ঞানের প্রেরণা। তাছাড়া, ডাঃ দুবোর গবেষণার ভিত্তিতেই অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা জীবাণুধ্বংসী ছত্রক বা অন্য জীবাণু নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কারে মন দিলেন। নিউজার্সির কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ডাঃ সেলম্যান ওয়াক্সম্যান তখন তাঁর আগেকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষাগুলির কথা স্মরণ করলেন। তিনি স্থির করলেন যক্ষ্মা বীজাণুধ্বংসী কোন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কারে আবার মনোনিবেশ করবেন। তিনি ও তাঁর সহকারীরা এই উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করলেন।

যক্ষ্মা জীবাণুর আবরণ ভয়ঙ্কর কঠিন, প্রায় দুর্ভেদ্য বলা যায়। এযাবত পরীক্ষিত কোন রাসায়নিক দ্রব্যই ঐ জীবাণু-প্রাচীর ভাঙতে বা জীবাণুদের মারতে পারেনি। একবার এই জীবাণু কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করলে এদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা একরকম অসম্ভব ছিল। এইভাবে প্রতি বছর বহু সহস্র লোকের প্রাণনাশ হচ্ছিল। জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা ক্ষয়রোগ বীজাণুর খাদ্য আত্মস্থ করবার ক্ষমতা রয়েছে অতএব সেই পথে তার খাদ্যের সঙ্গেই এই জীবাণু বিধ্বংসী দ্রব্য পাঠনো যেতে পারে। ডাঃ ওয়াক্সম্যান সেই পন্থানুসন্ধানে মনোনিবেশ করলেন।

এই সময় দ্বিতীয় মহাসমর বেধে গেল। তখন পেনিসিলিন পূর্ণ মাত্রায় উৎপাদন হতে শুরু হয়েছে এবং অভাবিতরূপে অগণিত মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগছে। নিউজার্সির বৈজ্ঞানিকদের নিশ্চিত ধারণা হল মৃত্তিকাজাত ছাতা থেকেই যখন একটা অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ বের করা গেছে তখন মৃত্তিকোৎপন্ন অন্য কোন

জীবদেহ থেকে অন্য কোন ওষুধও বের করা যাবে। দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁরা কাজ করে চললেন। ১৯৪৪ সালে ডাঃ ওয়াক্সম্যান 'স্ট্রেপ্টো-মাইসিন' নামক প্রথম যক্ষ্মা-জীবাণু ধ্বংসকারী ওষুধটি আবিষ্কার করেন। এটা মৃত্তিকাজাত জীবাণু থেকেই উৎপন্ন এক প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ। এতে যক্ষ্মাজীবাণুর পুষ্টি, সংখ্যা-বৃদ্ধি ও ক্ষমতা রোধ হয়। বর্তমানে অনেকগুলি কোম্পানির কর্তৃক উৎপন্ন হয়ে বিপুল পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে। নিউ জার্সির অন্তর্গত রওয়ে-এর মার্ক কোম্পানিই প্রথম এর উৎপাদন ও প্রয়োগ পরীক্ষা আরম্ভ করে। ল্যাবরেটরির পরীক্ষা নিরীক্ষার গণ্ডি থেকে এই ওষুধকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করে তোলা রসায়ন-সম্পর্কিত যন্ত্র-বিজ্ঞানের বড় কম ক্ষমতার পরিচায়ক নয়। স্ট্রেপ্টোমাইসিন উৎপাদনের জন্যে বর্তমানে এই কোম্পানিরই চারখানা বাড়ি আছে, তিনটি ভার্জিনিয়ায় আর একটি নিউ জার্সিতে। এই সব বাড়ি ও সরঞ্জামের দাম সবসুদ্ধ পঁয়ত্রিশ লক্ষ ডলার। ওষুধের চাহিদা এখন এত বেশি যে, এই বিপুল অর্থের ঝুঁকি নেওয়া কোম্পানির কাছে কিছুই নয়।

পেনিসিলিনের মত স্ট্রেপ্টোমাইসিন-এর ক্ষেত্রেও অতি অল্প পরিমাণ ওষুধ উৎপাদনের জন্যে বিস্তর মেহনতের প্রয়োজন। যাহোক যন্ত্রপাতির উন্নতির ফলে এখন প্রতি মাসে হাজার পাউণ্ড ওষুধ তৈরি করতে মাসে এক কোটি পাউণ্ড কাঁচা মাল ও চার কোটি পঞ্চাশ-লক্ষ গ্যালন জল দরকার হয়। ডাঃ ওয়াক্সম্যান-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত স্ট্রেপ্টোমাইসিন চাষের আদি নমুনা মার্ক কোম্পানি সযত্নে রেখেছেন। সেই থেকেই গাঁজানো প্রক্রিয়ায় প্রচুর উপাদান তৈরি করা হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওষুধটি সুলভ হওয়ায় বর্তমানে এটি আর পীড়িত জনসাধারণের সাধ্যাতীত নয়।

যদিও প্রথম প্রথম স্ট্রেপ্টোমাইসিন ব্যবহার করে ডাক্তাররা জেনেছিলেন, মাত্র কয়েকটি বিশেষ ধরনের যক্ষ্মারোগেই এটি কার্যকরী। পরে এ ওষুধের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়েছে। মেয়ো-ক্লিনিকের খবরে দেখা যায়, ডাক্তাররা বিভিন্নভাবে এটা প্রয়োগের চেষ্টা করছিলেন এবং আরো কতকগুলি এই জাতীয় রোগে কার্যকরী হয়েছে। আশা করা যায়—ক্রমশ এমন একদিন আসবে যখন সর্বাধিক ব্যাপক ক্ষয়রোগ অর্থাৎ ফুসফুসের যক্ষ্মা এতে আরোগ্য হবে। আর সেইটাই হবে চূড়ান্ত সাফল্য।

দুর্ভাগ্যবশত এই ওষুধ ব্যবহারে কতকগুলি বিশ্রী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যা এখনো রোধ করা যাচ্ছে না—সে এক মহা সমস্যা! তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ভুল মাত্রা নির্ধারণ করে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার লোক স্ট্রেপ্টোমাইসিন ব্যবহারে জীবন ফিরে পেল। শোনা যাচ্ছে এই ওষুধ পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালি ও ফ্রান্স সর্বত্রই যাচ্ছে। এ ওষুধকে সম্পূর্ণ শক্তিশালী করতে হয়ত ডাক্তারদের এখনো ব্যবহার করে করে অনেক পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই যেটুকু জানা গেছে তাতেই স্ট্রেপ্টোমাইসিনকে আমরা বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলতে পারি।

লতাপাতা থেকে ওষুধ

নতুন নতুন ওষুধের সন্ধান চলল। নবাবিষ্কৃত রাসায়নিক ওষুধগুলি দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত রোগ সারানো সম্ভব নয়। তাছাড়া পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি প্রতিষেধগুলি ব্যবহার করতে

করতে, দেহে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে ওঠে, তাই সংপর্যায়ের অন্য ওষুধ চাই।

উদাহরণ স্বরূপ পেনিসিলিনের কথাই ধরা যাক। দেখা গিয়েছে পেনিসিলিন যখন ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, আর এরকম প্রয়োগের মাঝে মাঝে দরকারও হয়,—রোগীর শরীরে একটা প্রতিরোধ শক্তি গড়ে উঠেছে, এবং এই অবস্থায় রোগী যদি পরে অন্য কোন অসুখে আক্রান্ত হয় এবং ঐ চিকিৎসার দরকার হয়, তখন পেনিসিলিনে কোন কাজ হয় না। তাছাড়া শরীরে যে সব রোগজীবাণু সুপ্ত অবস্থায় থাকে তারা আস্তে আস্তে এই ওষুধের প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। কালক্রমে হয়ত পেনিসিলিনে অভ্যস্ত যাবতীয় রোগ-জীবাণুগুলিই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—চিকিৎসকদের মনে এমন আশঙ্কাও জেগেছে। তবে আশার কথা, ইতিমধ্যেই এমন কয়েকটি ওষুধও আবিষ্কার হয়েছে, যেগুলি পেনিসিলিন অকেজো হলে ব্যবহার করা চলতে পারে। ডাঃ রেনি ডুবোর আবিষ্কার গ্রামিসিডিন-এর কথা ধরা যাক। এই ওষুধটি এবার নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এবং এইভাবে এর প্রয়োগ-ক্ষেত্র প্রসারিত করা গেল। ১৯৫২ সালের মধ্যে অনেকগুলি প্রতিষেধ ওষুধ, যাদের আমরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে জানি, আবিষ্কৃত হল। এবং কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নতুন ওষুধের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি বাল্টিমোরে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব মেরীল্যাণ্ড স্কুল অব মেডিসিন-এর ডাঃ জন. সি. কানুজ তালিকা সঙ্কলন করে দেখিয়ে দিয়েছেন,—সেগুলি হচ্ছে (পেনিসিলিন ও স্ট্রেপ্টোমাইসিন ছাড়া) ক্লোরোমাইসেটিন, অরিওমাইসিন ও টেরামাইসিন।

ক্লোরোমাইসেটিনের দ্বারা—সংক্রামক সান্নিপাত, সান্নিপাতিক জ্বর, পার্বত্য জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি কয়েকটি মারাত্মক ব্যাধির আরোগ্য হয়। ডাঃ মিলড্রেড রেবস্টক নামক জনৈক মহিলা-চিকিৎসক প্রথমে এ ওষুধটার রসায়ন-ঘটিত প্রস্তুত-পদ্ধতি সম্পন্ন করেন। ফলে এটি আরো বেশি রকম চালু হতে পেরেছে।

প্রতিবৎসর এভাবে বৈজ্ঞানিকরা নতুন নতুন মহোপকারী ওষুধের আবিষ্কার করছেন।

ব্যাসিট্রাসিন নামে একটি ওষুধ বেরিয়েছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যা কলেজের দুজন ডাক্তার এটি আবিষ্কার করেন। এঁদের একজন হলেন ডাঃ ফ্রাঙ্ক মিনিলি। আর একজন মিস বলবিনা জনসন। মানুষের দেহে সংক্রমণ রোধ করবার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, তাঁরা সেই ক্ষমতার রাসায়নিক জ্ঞান অর্জন করতে হাসপাতালে আগত দুর্ঘটনায় আহত ও গুরুতর দুষ্ট-ক্ষতযুক্ত রোগীদের পর্যবেক্ষণ করতেন এবং রক্ত ও দুষ্টবিধানতন্তু-সমূহ পরীক্ষা করে দেখতেন।

অবশেষে পায়ের হাড়-ভাঙা একটা মেয়ের ক্ষতস্থানে ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান পেলেন। মনে হল কতকগুলি বীজাণু বিষদুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে; সেখান থেকে কিছু জীবাণু তাঁরা ল্যাবরে-টরিতে নিয়ে গেলেন এবং তাই নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। অর্থাৎ জীবাণুর চাষ করে সংখ্যায় বাড়িয়ে নিলেন। অবশেষে দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য শ্রমের পর তাঁরা এই সব জীবাণু থেকে এমন একটা পদার্থ আবিষ্কার করলেন যা দুষ্টি-জীবাণু ধ্বংস করে। ডাঃ মিনিলি ও মিস জনসন এই পদার্থের নাম দিলেন ব্যাসিট্রাসিন অর্থাৎ জীবাণুর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যাসিলির অর্ধেক, ও মার্গারেট ট্রেসি, যার যার ভাঙা পায়ের ক্ষত থেকে এই জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল

—তার নামের অর্ধেক, এইভাবে ব্যাক ও ট্রেসি যুক্ত করে এই নামকরণ হল।

ব্যাসিট্রাসিন আনকোরা নতুন ওষুধ হলেও ইতিমধ্যেই বেশ কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমে এ ওষুধের প্রয়োগ হত স্থানিক ভাবে। ডাঃ মিনিলি ফোড়ায় ব্যাসিট্রাসিন ইনজেকশন করতেন অথবা ঘা বা অন্য কোন ক্ষতে মলম হিসাবে ব্যবহার কবতেন। এর সংক্রমণ-রোধ ক্ষমতা ও বেদনা উপশম শক্তি আশ্চর্য রকম। রক্ত প্রবাহের ভেতর রোগ বীজাণুব সঙ্গে লড়বার জন্যে আজকাল সলিউশান হিসাবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। পেনিসিলিনের মত দেহ-পেশীতে এ ওষুধ ইনজেকশন দেওযা হয় এবং এই নিয়ে এখনো নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

টোম্যাটিন নামে আর একটি ওষুধ ১৯৪৬ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের বৈজ্ঞানিক ডাঃ আর্ভিং স্টোন ও ডাঃ ডি টি ফনটেন এটি তৈরি করেন। টম্যাটো গাছের পাতা ও ডাঁটার রস থেকে এই ওষুধের সৃষ্টি। এই রসের সবুজ রঙের পদার্থটা বের করে নিয়ে অবশিষ্ট রসটুকু বায়ুশূন্য পাত্রে রেখে পাতন প্রক্রিয়ায় ঘনীভূত আকারে পরিণত করা হয়।

ক্ষুদ্র ছত্রক বা ঈস্ট থেকে যেসব বিষ সংক্রমণ হয় তাতে টোম্যাটিন খুব কার্যকরী। খেলোয়াড়দের পায়ের ব্যাধি—ভুক্তভোগী অনেকেরই সে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, সারানো খুবই শক্ত, টোম্যাটিন এ রোগে বিশেষ উপকারী। তাছাড়া আরো অনেক রোগে এর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

মিষ্টি আলু, রসুন, বাঁধা কপি, সয়াবিন, বুনো আদা ও আরো অন্যান্য উদ্ভিদ থেকে রোগজীবাণুধ্বংসী পদার্থ আবিষ্কার করা হয়েছে। গত কয়েক বছরে বৈজ্ঞানিকরা এমনি অনেক গুলি ওষুধ আবিষ্কার

করেছেন এবং সে-সবই ডাঃ ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিন ও ডাঃ ডুবোর গ্রামিসিডিন আবিষ্কারের পশ্চাদনুসরণ করে। সদ্য আবিষ্কৃত বলে ডাক্তাররা এখনো সবগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করে গুণাগুণ, উপকারিতা ও কার্যকারিতা এবং রোগজীবাণুদের বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা সঠিক নির্ধারণ করতে পারেন নি।

ম্যালেরিয়া বিজয়

যে সব নূতন ওষুধ ম্যালেরিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম তাদের আমরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান বলতে পারি।

এই ওষুধ অনুসন্ধানের পেছনে পরোক্ষভাবে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অনেকগুলি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমেরিকার সরকারি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগও এই অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করেন। আমেরিকার সৈন্যেরা সুদূর প্রাচ্য অঞ্চলে অবতরণ করে অনেকে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। একমাত্র ওষুধ কুইনাইন, সাময়িকভাবে রোগের উপশম করতে পারে। কিন্তু সাময়িকভাবে চাপা পড়লেই ত হয় না। ম্যালেরিয়া এমন রোগ, আরোগ্য হলেও কিছু দিন অন্তর অন্তর আবার দেখা দেয়—কখনো বা বহুবছর পরেও আবার আক্রমণ করে। তাছাড়া শরীরে এমন খারাপ প্রতিক্রিয়া রেখে যায় যাতে কেউ কেউ কখনোই সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারে না।

ম্যালেরিয়া অবশ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তেমন ব্যাপক নয়। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য অংশে প্রতি বছরে প্রায় ত্রিশ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে আর তার মধ্যে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মারা পড়ে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ভারত, ব্রহ্মদেশ, চীন, ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব-

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, নিউ গিনি ও দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি অংশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ভীষণ। আর এসব অঞ্চলগুলিতেই আমেরিকানদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কাজেই ম্যালেরিয়া দমন সৈন্যদের নিরাপত্তার একটা বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা কাঠফাটা জ্বর ও কাঁপুনি নিয়ে লোকে ত আর লড়াই করতে পারে না!

দক্ষিণ আমেরিকার সিঙ্কোনা নামক গাছের ছাল থেকে কুইনাইন তৈরি হয়। এই সিঙ্কোনার চাষ সুদূর প্রাচ্যে সর্বত্র হয় এবং বিশেষ করে জাভাতে। আমেরিকানরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িবার পর বহুকাল [illegible] বিশেষ অসুবিধার মধ্যে ছিল। তারউপর পশ্চাদপসরণ এত বিলম্বিত লয়ে হচ্ছিল যে, জাপানীরা জাভায় হানা দেবার অনেক আগেই সে সব অঞ্চলে আমেরিকান ও মিত্রশক্তির জাহাজগুলি [illegible] বিপন্ন অবস্থায় পড়ে। এইভাবে যুদ্ধের গোড়ার দিকেই সেই মূল্যবান সিঙ্কোনা ছালের বৃহত্তম উৎস থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, অথচ তখনই কুইনাইনের দরকার সবচেয়ে বেশি। কেননা সৈনিকদের তখন সুদূর প্রাচ্যের ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত দ্বীপগুলিতে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল।

এই সময় সংশ্লেষমূলক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন এ্যাটাব্রিন কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করা শুরু হল এবং ভালই ফল পাওয়া গেল। কিন্তু দেখা গেল কোন কোন রোগীর এ্যাটাব্রিন আদৌ সহ্য হয় না; খেয়ে গায়ের রঙ হলদে হয়ে যায়, আর অসুখ যেন বেড়ে ওঠে। কাজেই কারো কারো উপকার হলেও, অনেকের কোন কাজেই লাগল না। তাছাড়া কুইনাইন-এর মত এ্যাটাব্রিন চিকিৎসার কয়েক বছর পরে ম্যালেরিয়ার আবার আক্রমণ হয়। কাজেই যুদ্ধরত সৈন্যদের মধ্যে এ্যাটাব্রিনের ব্যবহার চলতে থাকলেও

যুক্তরাষ্ট্র-সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ থেকে, আরো উন্নততর ওষুধের সন্ধান চলতে লাগল।

যুদ্ধকালীন এই সরকারি প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে শত শত বৈজ্ঞানিক ১৪০০ (চৌদ্দশত) রকমের ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। ১৯৪৪ সালে এই প্রতিষ্ঠান, সংক্ষেপে OSRD, বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকদের এই ধরণের একশ রকম রাসায়নিক পদার্থ পাঠিয়ে দিলেন, ম্যালেরিয়া নিবারক ওষুধ আবিষ্কারে সাহায্যের জন্যে—অবশ্য কুইনাইনের মত সাময়িকভাবে চাপা না দিয়ে যাতে রোগ সম্পূর্ণ নিবারণ করতে পারে তারই চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া প্রচলিত ওষুধের মত যেন চিকিৎসার প্রতিক্রিয়াজনিত দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা না থাকে।

যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এই নিয়ে গবেষণা শুরু করল এবং বিশেষ করে এই কাজের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম যোগাড়-যন্ত্র করল এদের মধ্যে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত ম্যালেরিয়া নিবারণ সমস্যার কোন সমাধান হল না। তারপর কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খবর পাওয়া গেল প্রার্থিত ওষুধটির অনুরূপ একটি ওষুধ তাঁরা পেয়েছেন। OSRD-র বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের হিসেবে এই ১৩,২৭৪ তম রাসায়নিক যৌগিক পদার্থটি পরীক্ষা করলেন। প্রথমে বানরের ওপর প্রয়োগ করে বিশেষ ভাল ফল না পাওয়ায় একরকম বাদ দিয়েই দেওয়া হয়েছিল। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে এর ফলাফল আরো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং মনুষ্য শরীরে প্রয়োগ করে এর নিরাময় ক্ষমতা আবিষ্কৃত হয়।

সেই বৎসরই যুদ্ধকালীন সাময়িক সংস্থা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও

উন্নয়ন, বিভাগ রহিত হল। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতিমূলক যে সব গবেষণা চলছিল সেগুলি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হল। যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য দপ্তর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানকে ও বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়কে এই নিয়ে গবেষণা চালাবার জন্য অর্থসাহায্যও করলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত এই গবেষণার সফল পরিসমাপ্তি হল। আরো বছর দুই এই নতুন ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ওষুধ '১৩২৭৪'-এর অসংখ্য পরীক্ষা হল স্বেচ্ছাসেবক শরীরে। তারপর ১৯৪৭ সালের শেষে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রবার্ট সি এল্ডারফিল্ড বাফেলোয় আমেরিকান রসায়ন সমিতিতে এই আশ্চর্যজনক সাফল্যের সংবাদ ঘোষণা করলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে এই ওষুধের গবেষণা ও প্রয়োগ-পরীক্ষাদি হয়েছিল। ডাঃ এল্ডারফিল্ড বললেন, এই ওষুধের চমৎকার আরোগ্য-ক্ষমতা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এখনো এ নিয়ে অনবরত পরীক্ষা চলছে। তিনি স্পষ্টই বলেন, আমরা এইভাবে গবেষণা করতে করতে যে আরো নতুন উৎকৃষ্টতর ওষুধ পেয়ে যাব না তা নিশ্চয় করে বলতে পারি না! এমন কথা একমাত্র বৈজ্ঞানিক-দের মুখ থেকেই শোনা যায়। বৈজ্ঞানিকের মন কখনো স্থির হয়ে বসে থাকতে জানে না,—সে নূতন থেকে নূতনতর জ্ঞানের সন্ধানে ছুটছেই। যা পাওয়া গেছে, তাতেই আর সন্তুষ্ট না থেকে তাঁদের চিত্ত উৎকৃষ্টতর পূর্ণাঙ্গ বস্তুর সন্ধানে অবিরল ধাবিত হয়।

এদিকে নতুন ১৩,২৭৪ ওষুধ বাজারে ছাড়বার উপযোগী উৎপাদন করবার পরিকল্পনা হচ্ছে। এবং আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যারা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল অথবা যারা ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে বাস করে, সবাই নিরাময় হয়ে উঠবে।

এই ওষুধের ব্যবহার ও ম্যালেরিয়ার বীজ-বাহক মশা ধ্বংস ব্যবস্থা এই দু-য়ে মিলে হয়ত একদিন পৃথিবী থেকে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হবে। তা যদি হয় তবে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে মানুষের একটি দুরন্ত শত্রুর উৎখাত হবে; পৃথিবী আরো নিরাপদ বাসোপযোগী হয়ে উঠবে।

কাজেই রোগ-বীজাণুর বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে নতুন নতুন রাসায়নিক দ্রব্যের সন্ধানে বিভিন্ন জীবাণু, ঈস্ট, ছত্রক ও নানা গাছ-গাছড়া নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রতিনিয়ত চলছে।

নবজীবনের স্পন্দন

প্রত্যাগত বোমারু বিমান

১৯৪৩ সাল। ইংলণ্ডে একটি মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে সামরিক বিভাগের লোকেরা বিশেষ সতর্কভাবে অন্ধকার নৈশাকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। রাতের কালো আকাশে ভোরের আলো ফুটতে অনেক দেরি। একটা বোমারু বিমানদল কয়েক ঘণ্টা হয় ফ্রান্সে উড়ে গিয়েছে, যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসবে। চিকিৎসা বিভাগের লোকেরা ওষুধ পত্তর ও প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে, যদি কেউ আহত হয়ে আসে। বহুদূর থেকে ভেসে এল গুঞ্জন ধ্বনি, এবং ক্রমে উচ্চতর হতে লাগল। পর্যবেক্ষণকারীদের একজন বলে উঠল—ঐ ওরা আসছে। বোমারু বিমানদল বিদ্যুদ্বেগে নিচে নেমে এল। বিমান ঘাঁটির কাছাকাছি আসতেই একটা গোলমাল শোনা গেল—ব্যাপার গুরুতর! একজন ভীষণভাবে আহত হয়েছে! কে একজন অতিকষ্টে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক বাহিনী এ্যাম্বুলেন্সে লাফিয়ে উঠল। বিশাল বোমারু বিমানটি অবতরণ করে স্থির হতে-না-হতেই তারা গিয়ে পাশে হাজির হল।

ভেতর থেকে একজন দরজা খুলে দিতেই একজন ক্যাপ্টেন-ডাক্তার তাড়াতাড়ি ঢুকে গেলেন। একজন মারাত্মক আহত হয়েছে। তার কাঁধ ও বাহু ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে অচৈতন্য, মুখ রক্তহীন পাণ্ডুর ও ঠোঁট দুটি নীল হয়ে গেছে; স্থানান্তরিত করা অসম্ভব। ডাক্তার তাড়াতাড়ি দোর-গোড়ায় এসে

মুখ বাড়িয়ে সহকারীদের তাড়াতাড়ি রক্ত সঞ্চারকারী যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে বললেন। শরীরে নতুন রক্ত-সঞ্চার করা ছাড়া লোকটিকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই।

আহত বৈমানিকটির পাশে যন্ত্রপাতি আনা হল। শরীরের রক্তের 'শ্রেণী' নির্ণয় করে পরক্ষণেই সমশ্রেণীর রক্ত, যা হয়ত ছুটিতে আগত অন্য কোন সৈনিকের দানে সঞ্চিত হয়েছিল, তার শিরায় প্রবাহিত হতে লাগল। ক্রমে নিস্পন্দ-প্রায় হৃদ্‌পিণ্ডে আবার সাড়া জাগল; প্রথমে খুব আস্তে তারপর জোরে, আরো জোরে, শেষে দেখা গেল সে চোখ মেলছে।

বাঃ, এইবার সামলে যাবে দেখা যাচ্ছে! ডাক্তার মৃদুস্বরে বললেন, এইবার তাকে নামিয়ে নেওযা সম্ভব হবে। খুব সাবধানে স্ট্রেচারে তুলে শুইয়ে ভাল করে বেঁধে দেওয়া হল যাতে বয়ে নেবার সময় নড়াচড়ায় ব্যথা না পায়। তারপর তাকে বিমান থেকে নামিযে এ্যাম্বুলেন্সে তুলল। সেখান থেকে তাডাতাড়ি তাকে ছাউনির অস্ত্রোপচার বিভাগে এনে ক্ষতের চিকিৎসা শুরু হল। পরের দিন তাকে নিরাপদ অঞ্চলে বৃহত্তর ও উন্নতধরণের যন্ত্রপাতি সম্বলিত হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওযা হবে—ক্রমে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে রক্তসঞ্চার ব্যবস্থা আবিষ্কারের ফলেই এ যাত্রা লোকটির প্রাণ রক্ষা হল।

১৯০০ সাল থেকে মানুষের দেহে বাইরে থেকে রক্ত সরবরাহ পদ্ধতি বেশ নির্দোষ ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে। আগে ডাক্তারদের ধারণা ছিল সব মানুষের রক্তই বুঝি এক রকম, তারতম্য একটুও নেই। কার্যকরী হত না বলে তখন রক্ত-সঞ্চারে বড় একটা আস্থা ছিল না। বিচিত্র শোণিত প্রবাহের রহস্য তখনো যথেষ্ট জানা যায়নি। তার উপাদানগুলি ডাক্তাররা ভালভাবে

জানতেন না বলে সঠিক প্রয়োগ হত না। তাই এই নিয়ে আর বিশেষ নাড়াচাড়া হয়নি। ডাঃ ল্যাণ্ডস্টেনার-এর হাতে সব বদলে গেল।

অস্ট্রিয়ার প্রাচীন মনোরম ভিয়েনা নগরী এই বৈজ্ঞানিকের বাসস্থান। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর কয়েক বছর ল্যাবরেটরিতে তিনি রক্ত নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর কাজ ছিল রক্তের উপাদান আবিষ্কার করা। তিনি বুঝেছিলেন রক্ত সম্বন্ধে যত জ্ঞান অর্জন করা যাবে ডাক্তাররা তত বেশি রোগীর জীবন বাঁচাতে পারবেন। অনেক দিন কাজ করবার পর প্রয়োজনীয় আশ্চর্য সব তথ্য তাঁর কাছে ধরা পড়ল।

১৯০০ সালে তিনি তার আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। এ আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রথম জানালেন সকল মানুষের রক্তই সমগোত্রীয় নয়—চারটি ভিন্ন প্রকারের। প্রত্যেক প্রকারের রক্ত তিনি পরীক্ষা করে নামকরণ করলেন—'এ', 'বি', 'এ-বি' এবং 'ও'। তিনি বললেন, এখন এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কেন এতদিন রক্ত-সঞ্চার কার্যে সাফল্যলাভ হচ্ছিল না। কোন 'এ' শ্রেণীর রক্ত-ধারীর দেহে 'বি' শ্রেণীর অথবা 'এ-বি' শ্রেণীর রক্ত সঞ্চার করা হলে তাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। কারণ প্রদত্ত রক্ত তার রক্তের সমগোত্রীয় নয় বলেই তার দেহ সে রক্ত গ্রহণ করতে পারে না।

ডাঃ ল্যাণ্ডস্টেনার আরো বললেন—এখন উপায় হচ্ছে সমস্ত রক্তদাতাদের রক্ত আগে পরীক্ষা করে দেখা দরকার যাতে অপরের দেহে সঞ্চার করতে হলে ঠিক তার রক্তের সমজাতীয় রক্ত দেওয়া যায়। এ রকম ব্যবস্থা করলে তবে রক্ত-সঞ্চার কাজটা সফল হবে ও মানুষের জীবন বাঁচবে।

সারা জগতের চিকিৎসকবর্গ এ বিষয়ে খুব আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন। বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকরা সর্বত্রই এই নূতন পদ্ধতি কার্যে প্রয়োগ করে দেখতে লাগলেন। ক্রমে রক্তদাতাদের কাছ থেকে রক্ত নেওয়া, সে রক্তের শ্রেণী-পরীক্ষা এবং হাসপাতালে রোগীদের দেহে রক্ত-সঞ্চার, সমস্ত প্রক্রিয়ারই উন্নততর কৌশল আবিষ্কৃত হতে লাগল। এইভাবে এক অতি প্রয়োজনীয় কার্যের প্রথম সোপান স্থাপিত হল।

প্রাতরাশে বুদ্ধি খুলল

এতেও কিন্তু সমস্যার শেষ হল না। তার মধ্যে একটা হল রক্তের জমাট বাঁধা। দাতার শরীর থেকে রক্ত বের করে নেবার দুই থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই রক্ত জমাট বেঁধে ওঠে। এতে কাজ চালানোর অসুবিধা হয় আর শত সাবধানতা অবলম্বনেও হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। রক্তের জমাট বাঁধা বন্ধ করার জন্যে একটা রাসায়নিক মিশ্রণের দরকার, আর সেই মিশ্রিত রক্ত শরীরে দিলে যেন রোগীর কোন ক্ষতি না করে।

কয়েক বছর ধরেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এমনি একটা কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিলেন। এমন সময় ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হল। হঠাৎ উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের আশু প্রয়োজনীয়তা বহুগুণ বেড়ে গেল, কেননা যুদ্ধে আহত সৈন্যদের বাঁচানোর জন্যে রক্ত সঞ্চারের দরকার।

১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৫ সাল। প্রায় এক বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই সমস্যার সমাধান করলেন। এঁদের ভেতর সবার আগে নাম করা যায় বেলজিয়ামের হাস্টিনের। তারপর যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ লুইসন ও ওয়েল এবং আর্জেন্টিনার ডাঃ

এ্যাগট। স্বতন্ত্রভাবে সবাই একই আবিষ্কার করলেন। এঁদের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি হাস্টিন সমর্থিত ডেক্সট্রোজ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সোডিয়ম সাইট্রেট ব্যবহার করলেন। এইটিই উন্নততর পদ্ধতি বলে প্রমাণিত হল।

এই ডাক্তাররা বহুদিন ধরেই রক্ত অবিকৃত রাখবার পদ্ধতি খুঁজছিলেন এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন উপায়ে আবিষ্কার করলেন।

দক্ষিণ আমেরিকার ডাঃ লুইস এ্যাগট-এর কাছে তত্ত্বটি নিম্নলিখিত উপায়ে ধরা পড়ল। একদিন প্রাতরাশের সময় তিনি একটা নরম আধ-সিদ্ধ ডিম ভেঙে পাত্রে রাখতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় খেয়াল হল, কাঁচা ডিমের সাদা অংশ বা এ্যালবুমেনটুকুই তো গরম করলে জমাট বেঁধে যায়! কিন্তু সোডিয়াম সাইট্রেট মিশ্রিত করে, সেটার জমাট বাঁধা ঠেকানো যায়, এই দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ সাধারণ তথ্যটুকুর কথা ভাবতে হল!—তাইত, রক্তের এ্যালবুমেনটুকুই তো জমাট বাঁধে, ফলে রক্ত-সঞ্চারে বিঘ্ন ঘটে। আচ্ছা, রক্তে সোডিয়াম সাইট্রেট দিয়ে পরীক্ষা করে দেখিনা! যদি রক্ত কণিকার কোনও ক্ষতি না করে তাহলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হয়।

সেদিন আর সকালে তাঁর প্রাতরাশ খাওয়া হল না। তাড়াতাড়ি ছুটলেন ল্যাবরেটরির দিকে। এক সহ-বিজ্ঞানীর কাছে তাঁর ধারণার কথা প্রকাশ করলেন এবং দুজনে মিলে কাজ শুরু করলেন। একটা প্রাণী-দেহ থেকে খানিকটা রক্ত নিয়ে তাতে সোডিয়াম সাইট্রেট প্রয়োগ করলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলেন। নাঃ, জমাট বাধে'ন! এইবার জীবদেহে প্রয়োগ করে দেখা দরকার। একটা জন্তুর শরীরে ঐ সোডিয়াম সাইট্রেট

মিশানো রক্ত ইনজেকশান করলেন। সোডিয়াম সাইট্রেট জন্তুর রক্ত প্রবাহে কোন ক্ষতি করবে না ত!

ঐকান্তিক আগ্রহে লক্ষ করতে লাগলেন—কয়েক মিনিট গেল, কয়েক ঘণ্টাও কাটল, শেষে কয়েকদিন পরেও কোন দুর্লক্ষণ তাঁরা দেখতে পেলেন না। তখন আবার অন্য কয়েকটি জন্তুর দেহে প্রযোগ করলেন, সকলক্ষেত্রেই সমান কার্যকরী হওযা চাই ত! পরীক্ষা করতে করতে তাঁরা সোডিযাম সাইট্রেট-এর মাত্রা পরিবর্তন করে কত কম প্রযোগে রক্ত অবিকৃত থাকে তা নির্ধারণে তৎপর হলেন।

অচিরেই তাঁরা তাদের আবিষ্কার ঘোষণা করলেন। সাইট্রেট মেশানো রক্ত সঞ্চারের ব্যবস্থা প্রচলন হওযার ফলে চিকিৎসা অনেক সহজ ও অধিকতর নিরাপদ হল। পরে অবশ্য এই রক্ত সংরক্ষণ পদ্ধতি আরো অনেক উন্নততর হযেছে। কিন্তু সবই এঁদের আবিষ্কারকেই ভিত্তি করে সম্ভব হযেছে।

১৯১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করল। ততদিনে সোডিযাম সাইট্রেট মিশ্রিত রক্ত ও প্রযোগ পদ্ধতি বেশ উন্নত হওয়ায় সামরিক হাসপাতালগুলিতে রক্ত-সঞ্চার বেশ নিরাপদ ও বিশেষ কার্যকরী হল। সাইট্রেট মিশ্রিত রক্ত সঞ্চারণের ফলে বহু লোক বেঁচে গেল। কিন্তু আর একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিল। পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহের অভাবে সামরিক হাসপাতালগুলির অফুরন্ত চাহিদা মেটাবার কোন উপায রইল না। যে স্বল্প পরিমাণ রক্ত আসে কযেক ঘণ্টার মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও এই সমস্যার সমাধান হল না। প্রয়োজন-মত সমগোত্রীয় রক্তদানেচ্ছু ব্যক্তিকে যথা সময়ে সাধারণ হাসপাতালেও পাওয়া যায় না বলে ডাক্তারকে রোগীর জীবনের আশা ছাড়তে হয়। তাই প্রত্যেক হাসপাতালে রক্তদানেচ্ছু

নাগরিকদের নাম ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরের একটা তালিকা রাখা হত, যাতে দরকার হলে তাঁরা চট করে এসে রক্ত দিয়ে যেতে পাবেন। প্রত্যেক নামের পাশে রক্তের শ্রেণী লিখে রাখা হত। হঠাৎ হয়ত কোন রোগীকে রক্ত দেওয়ার আশু প্রয়োজন উপস্থিত হল, অমনি ডাক্তার টেলিফোনে ডেকে অথবা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে রোগীর যোগ্য রক্ত-দাতাকে খবর দিলেন। রক্তদাতা পৌছনো মাত্র তার গা থেকে রক্ত নিয়ে রোগীর দেহে সঞ্চার করা হল।

কিন্তু বিস্ফোরণ অগ্নিদাহ প্রভৃতি বড় রকমের দুর্যোগে বহুলোক একযোগে আহত হলে অবস্থা খুব সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াত। এত লোককে বাঁচাবার মত সঞ্চিত রক্ত হাতের কাছে কোথায় পাওয়া যাবে! আর এত লোককে রক্ত দেবার উপযুক্ত রক্তদাতাদের যথা সময়ে একসঙ্গে এনে হাজির করাও সম্ভব নয়।

রেফ্রিজারেটরে প্রাণপ্রবাহ মজুত

আহা! আকস্মিক জরুরি প্রযোজন মেটাবার জন্যে যদি রক্ত মজুত রাখা যেত! পৃথিবীর সমস্ত ডাক্তারদেরই মনে এই আকাঙ্ক্ষার উদয হল।

রাশিয়ায মস্কোর এমার্জেন্সি হাসপাতালের প্রধান অস্ত্রোপচার-বিশারদ ডাঃ সার্জিয়াস য়ুডিন ও তাঁর সহকারী মেরী স্কাউদিনা একটি আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কাব করলেন। একদিন ডাঃ য়ুডিন যথারীতি হাসপাতালের কাজে ব্যস্ত আছেন, এমন সময়ে দু-খানা গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতররূপে আহত একজন লোককে সেখানে আনা হল। ডাঃ য়ুডিন দেখলেন লোকটার ভাঙা হাড় ঠিক ভাবে বসিযে ক্ষতস্থান ওষুধ দিযে বেঁধে দেবার আগে দেহে রক্ত সঞ্চার করা একান্ত দরকার।

তিনি একজন সহকারীকে ডেকে বললেন, দেখ ত এক্ষুনি এর জন্যে রক্তদানেচ্ছু কোন লোক যোগাড় করা যায কিনা!

সহকারী আহত লোকটির রক্ত পরীক্ষা করে শ্রেণী নির্ণয করতে গিযে দেখল—এই শ্রেণীর লোক খুবই বিরল। হাসপাতালে রক্ত-দাতাদের নামের তালিকায এই শ্রেণীর লোক খুবই কম! যদি ওদের কাউকে পাওযা যায—এই ভরসায শহরের চারদিকে টেলিফোনযোগে অনুসন্ধান করতে লাগল। কিন্তু কারো সন্ধান পাওযা গেল না। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষমান ডাঃ য়ূডিন ও মেরী স্কাউদিনাকে সংবাদটা জানানো হল। খবর শুনে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। বুঝলেন আহত লোকটিকে বাঁচাবার আর কোন উপায়ই নেই।

মেরী স্কাউদিনা বললেন,—আচ্ছা 'অমুক' লোকটিকে খুঁজে বের করা যায় না? তার রক্ত কিন্তু ঐ শ্রেণীর। সহকারী বলল, দেখলাম ত চেষ্টা করে; তার কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। তখন মেরী স্কাউদিনা বললেন, ঐ শ্রেণীর খানিকটা রক্ত রেফ্রিজারেটরে তিনি রেখে দিয়েছেন সোডিয়াম সাইট্রেট মিশিয়ে।

সহকারী জিজ্ঞাসা করল, কী কাজে লাগবে!

মেরী স্কাউদিনা উত্তর দিলেন, এমন মূল্যবান জিনিসটা ফেলে দিতে পারলুম না। তবে এখন ভাবছি জিনিসটা খারাপ না হয়ে ব্যবহারযোগ্য আছে কিনা কে জানে।

সে কি আর ব্যবহার করা যাবে? সহকারী সন্দেহ প্রকাশ করে।—সে ত অনেক পুরনো হয়ে গেছে!

ক-দিন হল! ডাঃ যুডিন জিজ্ঞাসা করলেন।

তিন দিন। উত্তর দিলেন মেরী স্কাউদিনা।

ডাঃ যুডিন হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন। তারপর বিবেচনা করে দেখলেন কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকটি মারা যাবে।

আচ্ছা, একবার চেষ্টা দেখা যাক না! মিস স্কাউদিনা নিয়ে এস ত', দেখা যাক।

মিস স্কাউদিনা ছুটে গিয়ে সীল-করা কাচের বোতলে দুর্লভ রক্তটুকু নিয়ে এল।

ডাঃ যুডিন সেটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাজাই ত দেখাচ্ছে! আর বিন্দুমাত্র ইতস্তত করলেন না, যদিও তিনি এবং তাঁর সহকারীরা এতে কিছু কাজ হবে বলে ভরসা করতে পারছিলেন না। কিন্তু চেষ্টা করতে ক্ষতি কি!

ডাঃ যুডিন মেরী স্কাউদিনাকে রক্তটুকু উত্তাপ দিয়ে ব্যবহারের উপযোগী করতে বলে তাঁর সহকারীকে নিয়ে 'সঞ্চারণ-যন্ত্র' ঠিক

করতে লেগে গেলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিন দিনের পুরনো রক্ত মুমূর্ষুর শিরায় শিরায় প্রবাহিত হল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটির অবস্থার উন্নতি লক্ষ করে সবাই বিস্মিত হলেন এবং অচিরেই সমস্ত শঙ্কা কেটে গেল।

তারপরই ডাঃ য়ুডিন ও মেরী স্কাউদিনা এই নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। সাইট্রেট মিশ্রিত রক্ত রেফ্রিজারেটারে রেখে রেখে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। সাইট্রেট মিশ্রিত রক্ত হিমাঙ্ক-রেখার কাছাকাছি তাপে রাখলে অনেক দিন তাজা ও ব্যবহার উপযোগী থাকে।

তাঁদের এই আবিষ্কার থেকেই ব্লাড-ব্যাঙ্কের সূত্রপাত। এর পর আকস্মিক জরুরি প্রয়োজনে পর্যাপ্ত রক্ত মজুত রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব হল; সে প্রয়োজন হাসপাতালেরই হোক আর যুদ্ধের সময় ফৌজের ছাউনিতেই হোক।

—

সে হল ১৯৩০ সালের কথা। তারপর ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঢক্কানিনাদ। এ কয় বছরে রেফ্রিজারেটর-এর অনেক উন্নতি হওয়ায় শিবিরে শিবিরে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহে কোন বাধা রইল না। কাজেই নাৎসিদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ইংরেজ ও রুশ সৈন্যেরা আহত হয়েও কখনো রক্ত সরবরাহের অভাব বোধ করেনি।

দায়িত্ববোধ

ডাঃ ফরেস্ট পিনকারটন নামে জনৈক আমেরিকান চিকিৎসক হনলুলুতে বসে নাৎসিদের ক্রমবর্ধমান শক্তির কথা ভাবছিলেন। এই দূরদর্শী ভদ্রলোক ১৯৪১ সালের গোড়াতেই বিশ্বের পরিস্থিতি অনুধাবন করে বুঝতে পেরেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রকেও একদিন এই মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে।

তিনি বিবেচনা করে দেখলেন নাৎসিদের মিত্রভাবাপন্ন জাপানিরা যদি যুদ্ধে নামে তাহলে তাদের প্রথম লক্ষ্যই হবে এই হনলুলু। এই [illegible] ভবিষ্যত আশঙ্কা করেই তিনি যথোপযুক্ত প্রস্তুতি অবলম্বনে মন দিলেন। প্রয়োজন মত যাতে বিভিন্ন শ্রেণীর রক্ত হাতের কাছে মজুত পাওয়া যায় সেজন্যে ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে হবে স্থির করলেন। আর, এক জায়গায় মজুত না করে বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক ব্যাঙ্ক স্থাপনই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন যাতে কোনটি শত্রু আক্রমণে বিধ্বস্ত হলেও অন্যগুলি রক্ষা পাবে এবং প্রয়োজন মত রক্ত সরবরাহ করতে পারবে।

এ সব করতে হলে যথেষ্ট জমি ও সাজ-সরঞ্জাম দরকার এবং জরুরি প্রয়োজনে যখন যেখানে দরকার তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে মোটর ট্রাকও চাই। এক কথায় অনেক টাকা চাই।

ডাঃ পিনকারটন স্থানীয় চেম্বার অফ কমার্সকে এ বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়ে কাজ আরম্ভ করবার জন্যে তাদের কাছ থেকে চার হাজার ডলার সংগ্রহ করলেন।

ডাঃ পিনকারটন-এর পরিকল্পনা কয়েকদিন বেশ একটা আগ্রহের সৃষ্টি করল। কিন্তু কয়েক মাস পরেও জাপানিদের তরফ থেকে কোন আক্রমণ হল না দেখে কতক কতক লোক

ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিকে অকারণ পয়সার-শ্রাদ্ধ বলে ব্যঙ্গ করতে লাগল। হনলুলুর চেম্বার অফ কমার্সও আর অর্থ সাহায্য করতে রাজি হল না।

কিন্তু ডাঃ পিনকাবটন কারো ঔদাসীন্য বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কান দিলেন না। তিনি মনে করলেন, জাপানিরা কখনো এ জায়গা আক্রমণ না করলেও তৈরি থাকতে দোষ কী? বিপদে পড়ে বোকা হওয়ার চেয়ে আগে থেকে সাবধান থাকা ভাল। কী ঘটবে কী না ঘটবে এ সব চিন্তা না করে কী ঘটতে পারে, দায়িত্ব-জ্ঞান সম্পন্ন লোক তাই ভাবেন এবং সেই অনুযায়ী ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি থাকেন।

ব্লাড ব্যাঙ্ক টিঁকিয়ে রাখতে গেলে আরো অর্থের প্রয়োজন কিন্তু কারো কাছ থেকে কোন সাহায্য না আসায় তিনি নিজেই ব্যয়ভার গ্রহণ করলেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানিরা যুদ্ধ ঘোষণা না করেই হঠাৎ হনলুলুর পাল হারবার আক্রমণ করে বসল। ফলে দারুণ বিপর্যয় ঘটল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সামরিক অসামরিক মিলিয়ে সবসুদ্ধ সাতশ লোক গুরুতর আহত হল। দুটো সামরিক হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার ও নার্সরা আহত বিপন্নদের প্রাণ বাঁচাতে ছুটে এল। অনেকেই মারা গেল, অবশিষ্টের অবস্থাও জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দোদুল্যমান।

আহতদের অনেকের দেহে রক্ত সঞ্চারের একান্ত প্রয়োজন। হাসপাতালে খুবই কম রক্ত মজুত ছিল, এবং যা ছিল অতি অল্প সময়েই নিঃশেষ হয়ে গেল। এদিকে শত শত আহত হয়েছে, তাদের বাঁচাতে হলে রক্ত সঞ্চারণ করতে হবে। ওদের শিয়রে শমন দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে কিন্তু ডাঃ পিনকারটন-এর ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি দ্বীপের নানা অংশে ছড়িয়ে থাকাতে অধিকাংশই অক্ষত ও অটুট রয়েছে। তিনি তাঁর ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। আর তাঁর ট্রাকগুলি তাজা রক্ত সরবরাহ করে বেড়াতে লাগল। মৃত্যুকে বিফল মুখে সরে দাঁড়াতে হল। শত শত নরনারী ও শিশু আবার জীবন ফিরে পেল।

জাপানিদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকাও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিভীষিকাময় প্রচণ্ড সংগ্রাম বেধে গেল যুগপৎ ইউরোপ ও এশিয়ায়, প্রশান্ত মহাসাগর ও অতলান্তিকের বীচি-বিক্ষুব্ধ বক্ষে। স্থল ও নৌবাহিনীর চিকিৎসা-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে রেডক্রশও একযোগে কাজ করছিল, তারাও পীড়িত ও আহতদের শোনিত সরবরাহের জন্য রক্ত সংগ্রহের কাজে লাগল। রক্ত সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে পর্যাপ্ত রক্ত-সঞ্চয় সমন্বিত ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হল।

সংবাদপত্র ও বেতার ঘোষণায় রক্তদানের জন্য আহ্বান জানানো হতে লাগল। হাজার হাজার লোক রেডক্রশ কেন্দ্রে রক্ত দান করতে এল। যুবতী নারী, স্বামী হয়ত বিদেশে যুদ্ধ করছে, অথবা মা বাবা, সন্তান হয়ত সামরিক চাকুরিতে নিয়োজিত, সবাই এসে সাগ্রহে রক্ত দিয়ে গেলেন। অন্যান্যরাও যুদ্ধরত ব্যক্তিদের জীবন-ত্রাণ কর্তব্য জ্ঞানে রক্ত দান করতে এগিয়ে এলেন। সুশিক্ষিত রেডক্রশ কর্মচারীগণ নিরাপদ ও যন্ত্রণা-বিহীন পদ্ধতিকে যতটুকু রক্ত নিলে ক্ষতি হবে না ঠিক সেই পরিমাণ সকলের শরীর থেকে গ্রহণ করলেন। তারপর এই সংগৃহীত রক্ত সাইট্রেট মিশ্রিত করে রেফ্রিজারেটরে পুরে ইউরোপ, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপময় অঞ্চলে যেখানে যেখানে আমেরিকান সৈন্য লড়াইয়ে নিযুক্ত ছিল, পাঠানো হল।

সুদৃঢ় প্রত্যয়

ডাঃ ম্যাক্স স্ট্রুমিয়া নামে ফিলাডেলফিয়ার একজন বৈজ্ঞানিক নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী কয়েক বছর ধরে রক্ত-সঞ্চার বিষয়ে গবেষণা করছিলেন।

সাইট্রেট মিশ্রিত রক্তও কখনো কখনো রোগীর শিরায় গিয়ে জমাট বেঁধে যায় দেখা গেছে। তখন রক্ত সঞ্চারণ কোন কাজে লাগে না, রোগী মারা যায়। তাছাড়া আকস্মিক গুরুতর আঘাতে রোগী অনেক সময় এত বেশি মুহ্যমান হয়ে পড়ে যে, রক্ত সঞ্চারে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। এইসব ক্ষেত্রে ডাক্তারদের বড় মুস্কিলে পড়তে হয় কিন্তু এর কোন প্রতিকার ছিল না।

ডাঃ স্ট্রুমিয়া এই সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করলেন। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মত তাঁরও বিশ্বাস কতকগুলি রোগে ও আঘাতে রক্তের সমগ্রভাগ সঞ্চার করার চেয়ে বরং রক্তের প্লাজমা অংশটুকু দেওয়ায় কাজ হয় বেশি। আর এই রক্তরস সঞ্চারের মস্ত সুবিধা হল রক্তের শ্রেণী বিচার করবার দরকার হয় না। কাজেই যুদ্ধে ও আকস্মিক জরুরি ক্ষেত্রে ব্যবহারেও বিশেষ সুবিধা হয়।

সমগ্র উপাদান সমেত রক্ত সঞ্চার বন্ধ করা হোক ডাঃ স্ট্রুমিয়া অবশ্য এমন মত পোষণ করতেন না। অনেক ক্ষেত্রে যে এর একান্ত প্রয়োজন। তাঁর ধারণা রক্তরস বা প্লাজমা সঞ্চারের মূল্য আলাদা। মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে একেও কাজে লাগাতে হবে।

ডাঃ স্ট্রুমিয়া তাঁর ল্যাবরেটরিতে রক্ত থেকে শ্বেত ও লোহিত কণিকাগুলি পৃথক করে পীতাভ তরল পদার্থ রক্তরসটুকু বের করে নিলেন। এই নিয়ে তিনি খরগোসের শিরায় ইনজেকশন করলেন। জীবন্ত প্রাণীর দেহ এই তরল পদার্থটুকু ঠিক গ্রহণ করল দেখে তাঁর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল। পরীক্ষিত খরগোসগুলির কোনটির কোন

ক্ষতি না হওয়ায় মানুষের দেহেও রক্তরস কোন ক্ষতির কারণ হবে না এ বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস বলবত হল।

কিন্তু সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের চিকিৎসকেরা রোগীদের ওপর রক্তরস প্রযোগ করতে সম্মত হলেন না। কেননা তাঁরা এর গুণাগুণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন না। ডাঃ স্ট্রমিয়া কিন্তু রক্তরস সঞ্চারের ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন এবং এই অসম্মতিতে ধৈর্যচ্যুত হলেন। আগ্রহ ও সহযোগিতার অভাব দেখে কিছুদিন পরেই সেখানকার সকল সম্পর্ক মিটিযে ব্রাইন মড় হাসপাতালে এসে যোগ দিলেন।

১৯৩৪ সালে যখন তিনি সেখানে কাজ করছেন, বারো বছরের একটা খুব রুগ্ন ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। ব্যাধি ভযানক—'স্কাইরকেটিং' জ্বরে ভুগছিল। কোন ডাক্তারই তাকে দেখে আশা করেননি এ ছেলে বেশিদিন বাঁচবে। আর কিছু করতে না পেরে স্থির করলেন—আগে ত কিছু তাজা রক্ত শরীরে সঞ্চার করা থাক। কিন্তু রক্ত দিযাই দেখা গেল শিরায জমাট বেঁধে যাচ্ছে। ফলে অবস্থা আরো সঙ্কটাপন্ন হল।

যে চিকিৎসকের অধীনে রোগীটি ছিল তাঁকে ডেকে ডাঃ স্ট্রমিযা বললেন—রোগীর বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই তো দেখছি না, একবার রক্তরস প্রয়োগ করে দেখা যাক না। আমার দৃঢ বিশ্বাস এতে কাজ হবে।

এ রকম একটা চরম অবস্থায় একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই ভেবে ডাক্তার রাজি হলেন। কিন্তু ছেলেটির কিছুমাত্র উপকার হবে হাসপাতালের কোন ডাক্তারেরই সে বিশ্বাস এতটুকু ছিল না ; তাঁদের ধারণা ছেলেটিকে বাঁচানোর কোন উপায়ই নেই। রোগী সমস্ত চেষ্টার বাইরে।

ডাঃ স্ট্রুমিয়া তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে তাড়াতাড়ি সরঞ্জাম প্রস্তুত করলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছেলেটির শিরায় রক্তরস প্রবাহিত করলেন। সবাইকে আশ্চর্য ও উৎফুল্ল করে ছেলেটির অবস্থা অনুকূল হয়ে এল। তারপর শুশ্রূষা ও অন্যান্য চিকিৎসার পর সে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

ছেলেটির রোগ-মুক্তি এমনি চমকপ্রদ যে, হাসপাতালের সকলেই মুগ্ধ না হয়ে পারল না। রোগীটির চিকিৎসক ডাঃ স্ট্রুমিয়ার রক্ত-রস সঞ্চার দ্বারা অভিনব চিকিৎসা-পদ্ধতির একটা বিবরণ লিখলেন।

তারপর একটা বিখ্যাত চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজে প্রকাশিত হওয়ায় আমেরিকা ও ইউরোপের ডাক্তার মণ্ডলী আগ্রহে সে বিবরণ পাঠ করলেন।

ক্রমে ক্রমে রক্তরসের চাহিদা বাড়ল। রক্তরস সংরক্ষিত করে যে কোন সময় জরুরি প্রয়োজনে যাতে সরবরাহ—করা যায় ডাঃ স্ট্রুমিয়া তার উপায় বের করলেন। রক্তরস শুকিয়ে হলুদ রঙের গুঁড়ো পদার্থে পরিণত করার জন্য একটা ছোটখাট কারখানা স্থাপন করলেন। প্রয়োজন মত শুকনো গুঁড়ো বীজাণুমুক্ত জলে গুলে ব্যবহারোপযোগী করে নেওয়া যাবে। ভালভাবে প্যাক করে সযত্নে রাখলে গুঁড়ো নষ্ট হবে না। খুব অল্প জায়গাতেই যথেষ্ট গুঁড়ো ধরে বলে হাসপাতালের জরুরি প্রয়োজনের জন্যে পর্যাপ্ত মজুত করে রাখা যায়।

কিন্তু তখনো অনেক ডাক্তার রোগীদের ওপর রক্তরস সঞ্চার করতে রাজি নন। ডাক্তারদের খুব হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করতে হয়, রোগীর জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করে তাঁরা ত নতুন পরীক্ষা চালাতে পারেন না! একটা ছেলে, চাই কি পাঁচটা লোকই না হয় সারল কিন্তু এ রকম দু একটা ঘটনা দেখে সব মানুষের ওপর

অবাধে রক্তরস প্রয়োগের ঝুঁকি নেওয়া সঙ্গত নয়। ফলে ডাঃ স্ট্রুমিয়ার আবিষ্কার অপ্রচলিত হয়ে রইল।

সেনা বাহিনীর চিকিৎসকদের চোখ খুলল

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেও দেখা যায় রক্তরস চালু হয়নি। তখনো রক্তের পুরো অংশই হাজার হাজার লোকের শরীরে সঞ্চার করা হচ্ছে। ইতিহাসে দেখা যায় এত বেশি লোককে রক্ত সঞ্চার করা আর কখনো হয়নি। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৯ সালে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ এবং পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসিদেব বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও রুশ সৈন্যদেব বিভিন্ন যুদ্ধ ঘাঁটিতে ট্রাকে বোঝাই সাইট্রেট মিশ্রিত বিভিন্ন শ্রেণীর পূর্ণাঙ্গ রক্তই সরবরাহ হয়েছে। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল এইভাবে আহতদের প্রয়োজনোপযোগী যথেষ্ট রক্ত সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

আমেরিকানরা যুদ্ধে নামবার আগে সামরিক বিভাগের অধিকর্তারা ইউরোপীয় রণাঙ্গনে ব্লাড ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ লক্ষ করছিলেন।

সব দেখে শুনে তাঁদের ধারণা হল সমস্ত পদ্ধতিটা ভাবি জবরজঙ্গ। এর চেয়ে কার্যকরী ও কম হাঙ্গামাযুক্ত একটা উপায় যুদ্ধের সময় দরকার। নেহাত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে সামরিক চিকিৎসা কেন্দ্র-গুলিতে আরো উন্নততর সাজসরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধি নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে।

দেশে রক্ত সঞ্চারণ-বিশারদদের মধ্যে এই সময় ডাঃ স্ট্রুমিয়া অন্যতম। ১৯৪১ সালে সামরিক বিভাগ তাঁর সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। রক্ত সরবরাহ ও প্রয়োগ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে ডাঃ স্ট্রুমিয়াকে অধিকর্তা নির্বাচিত করা হল।

ডাঃ স্ট্রুমিয়া প্রথমেই সামরিক বিভাগকে বোঝালেন সরবরাহ সমস্যার একমাত্র উপায় শুকনো রক্তরস বা প্লাজমা ব্যবহার করা।

সামরিক বিভাগের চিকিৎসকরা বিষয়টাকে পক্ষপাতহীন ভাবে যাচাই করতে রাজি হলেন এবং রক্তরসের শুকনো গুঁড়ো ব্যবহার করে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। কিন্তু এই পরীক্ষা শেষ হবার আগেই ১৯৪১ সালের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। রেডক্রশ হিমাঙ্কে রক্ষিত মজুত রক্ত প্রচুর পরিমাণে রণাঙ্গনে পাঠাতে লাগল। এদিকে সামরিক বিভাগীয় চিকিৎসকরা ডাঃ স্ট্রুমিয়ার শুকনো রক্তরস প্রয়োগ করে চমৎকার সুফল পাওয়ায় অধিকর্তাদের কাছে সে বিবরণ পাঠালেন।

১৯৪৩ সাল নাগাদ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল শুকনো রক্তরস প্রয়োজন মত গুলে নিলে ছাউনি-হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে চমৎকার কার্যকরী হবে। আর ধাক্কা বা আঘাতজনিত ক্ষতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামগ্রিক রক্ত সঞ্চারের চেয়েও ভাল কাজ দেবে। দেখতে দেখতে বড় বড় ওষুধ উৎপাদক কোম্পানিগুলি কার্যক্ষেত্রে এগিয়ে এল। এইসব কোম্পানি ডাঃ স্ট্রুমিয়ার নির্দেশানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় সামরিক প্রয়োজনে শুকনো রক্তরস-গুঁড়ো তৈরি করবার কাজে লেগে গেল। এইবার রেডক্রশ সংগৃহীত রক্ত শুকনো রক্তরস তৈরি করবার জন্যে বিভিন্ন কারখানায় পাঠাতে লাগল। রক্ত কণিকাগুলি আলাদা করে পীতাভ তরল রসাংশটুকু বায়ুশূন্য বিশেষ পাত্রে রেখে নিরুদক করা হল। ফলে এক প্রকার হলদে গুঁড়ো তৈরি হল আর তাদের ভর্তি করা হতে লাগল ছোট ছোট শিশিতে। প্রতি শিশিতে এক বোতল রক্ত থেকে প্রাপ্ত পরিমাণ শুকনো গুঁড়ো ভর্তি করা হল।

সেগুলি আবার একটা টিনের কৌটোর মধ্যে গুঁড়ো গুলবার এক বোতল পরিশুদ্ধ জলের সঙ্গে বসিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে রইল একটি করে রবারের নল ও ইনজেকশনের সূচ। এইভাবে রক্ত সঞ্চারের পুরো সরঞ্জাম একেবারে একসঙ্গে সীল করে বিভিন্ন যুদ্ধাঞ্চলে সহজে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হল। ফলে আরো বহু সহস্র আহত লোক রক্তরস ব্যবহারে রক্ষা পেল।

রক্তরস গুঁড়ো এই ভাবে বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের গোড়া থেকেই উৎপাদন ও ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় রক্তের উপাদানগুলিই আমাদের জীবনত্রাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শোণিত প্রবাহের আরো রহস্য

করে গবেষণা সদা একমনে
কভু একা একা কভু পাঁচ জনে।

মনুষ্য-রক্ত সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্যই জানা গেছে। সামগ্রিক-রক্ত বা রক্তরস সঞ্চারে বহুপ্রাণ বেঁচেছে। তা সত্ত্বেও অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে চিকিৎসকদের এমন সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যে, তারা ভেবে কোন কূলকিনারা ঠিক করতে পারেন না। তাই ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকরা উঠে-পড়ে লাগলেন শিরার মধ্যে প্রবহমান জীবনীশক্তির অজ্ঞাত রহস্য জানবার জন্যে।

রচেস্টারের মেয়ো ক্লিনিক, মিনেসোটা ও নিউ ইয়র্কের রকফেলার ফাউণ্ডেশান ইনস্টিটিউট প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্লিনিক ও গবেষণাগারে এই নিয়ে গবেষণা চলল। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল-স্কুলগুলিতেও এই নিয়ে গবেষণা শুরু হল।

এত করেও দেখা গেল কতকগুলি জটিল বিষয়ের কোন সমাধান হচ্ছে না। রক্ত সঞ্চার করতে গিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যায় মোটেই কার্যকরী হচ্ছে না। অথচ এর সঠিক কোন কারণও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। তাছাড়া ইরিথ্রোব্লাস্টোসিস নামক এক প্রকার ভয়াবহ শোনিত ব্যাধি নিয়েই কতক শিশু জন্মায়।

এর কবলে পড়ে অনেকে চিরতরে রোগা হয়ে যায়। বাকিরা অকালে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়।

কখনো কখনো এই রোগ নিয়ে শিশু জন্মাবার কয়েক ঘণ্টা কখনো বা কয়েকদিন পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। পিতামাতার কী দুর্ভাগ্য! সন্তানের মুখ দেখবার সুখ উপভোগ করতে না করতেই তাকে হারাতে হয়!

চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকরা ভাবতে লাগলেন এই রোগের কারণ কী? এর মূল কারণ জানতে পারলে রোগগ্রস্ত নবজাত শিশুদের বাঁচানো শক্ত হবে না!

জীবন রক্ষা, লুপ্ত স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার ও পুষ্টিসাধনের জন্যে রক্তের সমস্ত রহস্য ডাক্তারদের জানা প্রয়োজন। আবার গবেষণা চলল।

ভিয়েনার বৈজ্ঞানিক ডাঃ ল্যাণ্ডস্টিনার, যিনি প্রথম রক্তকে মোটামুটি চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন, এই সময় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন।

১৯২৭ সালে নিউইয়র্কের রকফেলার ইনস্টিটিউট তাঁকে সেখানে কাজে যোগদান করতে আমন্ত্রণ করে এবং তখন থেকেই তিনি সেখানে কাজ করছিলেন। মনুষ্যরক্তের অনেক কিছু তথ্য এবং কতকগুলি রোগ নিরাময়ের উপায় আবিষ্কার করায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

ডাঃ ল্যাণ্ডস্টিনার-এর সহকারী তরুণ বৈজ্ঞানিকরা সবাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আসবার আগে চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা করে এসেছেন। তাঁদের কাছে অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ ডাঃ ল্যাণ্ডস্টিনার মনীষাগুণে অগ্রজ তুল্য ছিলেন।

তাঁর এমনি অন্তরঙ্গ সাহচর্যেই ডাঃ ফিলিপ লেভিন ও পরে ডাঃ আলেকজাণ্ডার উইনার রক্ত নিয়ে গবেষণা করতে পেরেছেন। ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

ডাঃ লেভিন ১৯৩০ সালে রাশিয়ায় ক্লেটস নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আট বছর পর্যন্ত আমেরিকা থেকে অনেক দূরে ভিন্ন পরিবেশে জীবনযাপন করেন। তারপরে এক ভীষণ বিপর্যয় ঘটল; পরিবারের সবাইকে দেশ ছেড়ে আমেরিকার উদ্দেশে পা'ড় দিতে হল। সুদীর্ঘ সমুদ্র ভ্রমণে বালকের শিশুমন ভয় ও বিস্ময়ে যেমন অভিভূত হল তেমনি অজানা নতুন দেশে ভবিষ্যত জীবনযাত্রা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠল। তবু ছেড়ে আসা গ্রাম ও পরিচিত জন্মভূমির জন্যে মনে কোন আকুলতা ছিল না বলা যায় না।

জাহাজ থেকে নিউইয়র্কের ডকে নেমে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে তাঁরা শহরে প্রবেশ করলেন। তারপর 'ট্রলি'তে করে সেতু পার হয়ে ব্রুকলিনে পৌছিলেন। এখানেই শহরের এক ধূসর রাজপথের ওপর একখানা বাড়িতে শুরু হল নতুন জীবন।

প্রাণোজ্জ্বল কিশোর ফিলিপ লেভিন ছেডে-আসা দেশের কথা ভুলে গিযে আমেরিকার জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। নিকটবর্তী একটি ইস্কুলে ভর্তি হলেন; সেখানকার ছেলেদের সঙ্গে খেলায মেতে উঠলেন এবং শীঘ্রই তাদেরই একজন হয়ে গেলেন। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে ফিলিপের ঝোঁক পড়ল ঔষধ-বিজ্ঞানে। হাইস্কুলের পাঠ শেষ করে নিউইযর্ক সিটি কলেজে ভর্তি হলেন। সেখানে তাঁর পাঠ্য-বিষয় ছিল প্রাথমিক চিকিৎসা-বিদ্যা ও জীবতত্ত্ব।

এই সময় অর্থাৎ ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলতে থাকা কালে স্টুডেন্টস আর্মি ট্রেনিং কোরে ভর্তি হয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শেযে লেভিন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল-স্কুলে ভর্তি হলেন। সেখান থেকেই এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং শিক্ষনবিশি শেষ করে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে পড়াশুনা ও গবেষণাও চলল। কালক্রমে

তিনি একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠলেন ও রকফেলার ইনস্টিটিউটে গবেষণার জন্যে এলেন।

• সেখানে তিনি ডাঃ ল্যাণ্ডস্টিনার-এর সঙ্গে গবেষণা করতে লাগলেন এবং ১৯২৮ সালে তাঁর সঙ্গে একযোগে রক্তের কয়েকটি উপাদান আবিষ্কার করলেন। অবশ্য এগুলি ডাক্তারদের রোগ-চিকিৎসায় কোন সাহায্য করল না, কিন্তু এই আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকদের রক্ত সম্বন্ধীয় গবেষণায় অনেক অগ্রগতি এনে দিল। রক্তে এই বিভিন্ন উপাদানগুলির অভাব বা অবস্থানের দরুনই বিভিন্ন দেহে রক্তের অভিন্নতা বা পার্থক্য দেখা যায়।

কয়েক বৎসর পরে ডাঃ লেভিন রকফেলার ইনস্টিটিউট ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। এখন তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে রত আছেন— বিশিষ্ট রক্তবিদ ও জীববিদ্যাবিশারদ। রক্ত সম্বন্ধেই বিশেষভাবে গবেষণা করেন এবং রক্তদুষ্ট রোগীদেরই চিকিৎসা করেন। তাঁর রোগের মূল কারণের অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞানই হয়ত একদিন আরো অনেকের জীবন বাঁচাতে পারবে।

এবার সবাই বাঁচবে

ইতিমধ্যে আলেকজাণ্ডার উইনারও (এঁরও মাতাপিতা রুশীয়) নামে এক আমেরিকান যুবক, গবেষক হয়ে উঠলেন। ১৯৩০ সালে আইনজীবি পিতা তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকায় আসেন। নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনে আলেকজাণ্ডারের জন্ম হয়। আট বছরের বড় ফিলিপ লেভিন ও তাঁর শৈশব একই পরিবেশে অতিবাহিত হয়, যদিও বহুদিন পর্যন্ত কেউ কাউকে চিনতেন না। বাল্যে আলেকজাণ্ডার অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন। পনরো বছর

বয়সে ইস্কুলের পড়া শেষ করে বৃত্তি পেয়ে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানকার মূল পাঠ্য বিষয় জীববিদ্যা হলেও নিছক আনন্দ লাভের জন্যই তিনি গণিত অধ্যয়নে মন দেন। তারপর লঙ আইল্যাণ্ড কলেজ অব মেডিসিন থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে ১৯৩০ সালে এম. ডি. উপাধি লাভ করেন। ব্রুকলিনের ইহুদি হাসপাতালে শিক্ষানবিশি শেষ করে রক্তের বিভিন্নতা এবং কী ভাবে রক্ত উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তানে সঞ্চারিত হয় তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।

তিনি কিছুদিন ফিলিপ লেভিনের মতই রকফেলার ইনস্টিটিউটে কাজ করতে আসেন ও রক্ত নিয়ে গবেষণা করেন। ১৯৩৭ সালে বহুবিধ গবেষণার পর তিনি এবং ডাঃ ল্যাণ্ডস্টিনার রক্তের আর একটি উপাদান আবিষ্কার করলেন। তাঁরা বানরের ওপর এক পরীক্ষা করেন ও দেখেন রেশাস জাতীয় বানরের রক্তে এই উপাদান বর্তমান আছে। সুতরাং এই উপাদানের নামকরণ করলেন ঐ বানরের নামের প্রথম দুটি অক্ষর দিয়ে, এর নাম দিলেন Rh উপাদান।. তখনকার মত ডাঃ ল্যাণ্ডস্টিনার এবং ডাঃ উইনার মনে করলেন তাঁদের এই আবিষ্কার কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকদেরই গবেষণার কাজে লাগবে। হাসপাতালের ডাক্তাররা রোগীদের ব্যাধি ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন তাঁদের আবিষ্কার সেই সংগ্রামকে প্রভাবিত করতে পারে তাঁরা কল্পনাও করেননি। পরবর্তী কালে ব্রুকলিন ইহুদি হাসপাতালে কাজ করবার সময় রক্ত সঞ্চার করতে গিয়ে ডাঃ উইনার মহা ফ্যাসাদে পড়লেন, অথচ তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন রক্ত সঞ্চারের ফল ভালই হবে। তখন তিনি স্থির করলেন রোগীর রক্তের Rh উপাদান যাচাই করে নেবেন। পরীক্ষা করে দেখলেন রোগীর রক্তে

Rh উপাদান বর্তমান অথচ যে রক্ত তার দেহে সঞ্চারিত করা হচ্ছে তাতে Rh উপাদানের একান্ত অভাব।

তাহলে এই Rh উপাদানের মিশ্রণেই কি কোন প্রকার গণ্ডগোল ঘটছে? তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন যথার্থ কারণ খুঁজে ফিরতে লাগল। গবেষণাগারে দুই শ্রেণীর রক্ত নিয়ে অনেকগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন এই দুইটি ভিন্ন শ্রেণীর রক্ত কিছুতেই মিশ খায় না। Rh উপাদান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেহে Rh উপাদানবিহীন রক্ত-সঞ্চারে শিরার ভেতর দুই জাতীয় রক্তে সংগ্রাম শুরু হয়। আর সেই সংঘর্ষের ফলে রোগী দেহত্যাগ করে।

অধিকাংশ লোকের—মোটামুটি বলা যায়,—শতকরা ৮৫ জন লোকের রক্তে Rh উপাদান আছে আর তাদের বলা হয় ধনাত্মক Rh বিশিষ্ট। শতকরা বাকি ১৫ জনের রক্তে সে উপাদান নেই। তাদের রক্ত ঋণাত্মক Rh উপাদান বিশিষ্ট। রক্ত-সঞ্চারের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটো ভিন্ন উপাদানের যোগাযোগ হয়ত হয় না তাই কোন গোলযোগ ঘটে না। কিন্তু যখনি তেমন কিছু ঘটে তখনই রোগী মারা পড়ে।

রক্ত প্রবাহের আর একটি রহস্য জানা গেল বলে সমস্যার সমাধান হল। অবশ্য পরবর্তীকালে রক্ত-সঞ্চারের ব্যাপারে আরো নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

এদিকে ডাঃ ফিলিপ লেভিনও রক্ত সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন। ডাঃ ল্যাণ্ডস্টিনার ও ডাঃ উইনার-এর সঙ্গে কোন যোগাযোগ না রেখেও তিনি পৃথকভাবেই Rh উপাদান আবিষ্কার করলেন। ডাঃ উইনার-এর মত তিনিও লক্ষ করলেন রক্ত-সঞ্চারে উক্ত দ্বিবিধ উপাদানের সংমিশ্রণ হলে কী মারাত্মক ফলই না হয়ে থাকে। তীক্ষ্ণধী বৈজ্ঞানিকের যোগ্য বুদ্ধিবৃত্তি ও অদম্য আগ্রহ

নিয়ে তিনি পরপর অনেকগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নির্ণয় করলেন এই দুই ভিন্ন প্রকার রক্তের সংমিশ্রণে কী কী পরিণাম হতে পারে।

নিউ জার্সির রারিটানে অর্থোরিসার্চ ফাউণ্ডেশনের তিনি ডিরেক্টর ছিলেন। আর নিউআর্ক নগরীর সন্নিহিত বেথ ইজরাইল হাসপাতালের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শেষোক্ত স্থানেই তিনি এই সব গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন।

কালক্রমে তিনি আবিষ্কার করলেন কেন শিশুদের ইরিথ্রো-ব্লাস্টোসিস রোগ হয়। পিতার রক্তে Rh উপাদান ধনাত্মক ও মায়ের রক্তের ঋণাত্মক উপাদান হলেই সন্তানের এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা। উক্ত দুই ভিন্ন শ্রেণীর রক্তের মিশ্রণ-জাত সন্তানের বাঁচবার আশা খুবই কম। প্রথমজাত সন্তান কোন রকমে রক্ষা পেলেও পরবর্তী সন্তানরা উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে সারাজীবন ভোগে বা আক্রমণ মারাত্মক হলে অকালেই প্রাণান্ত ঘটে।

ডাঃ স্ট্রেটসন-এর সহযোগিতায় ডাঃ লেভিন এই গবেষণা সমাপ্ত করে আবিষ্কৃত তত্ত্বের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখলেন। সেটি ১৯৪১ সালে জার্নাল অফ দি আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন-এ প্রকাশিত হয়। তাঁদের এই আবিষ্কার রক্ত-রোগ সংগ্রামে দিশেহারা চিকিৎসকদের পক্ষে চিরস্থায়ী ও বহু জীবনাপহারক ব্যাধি জয়ের চমৎকার হাতিয়ার হল।

এবার দেখি ডাঃ উইনার ইতিমধ্যে কী করিলেন! কারণ তাঁদের দুজনের গবেষণা বরাবর পাশাপাশি চলেছে। একজনের আবিষ্কার অন্যকে উন্নততর আবিষ্কারের পথে অনুপ্রাণিত করেছে। দুইজনের মধ্যেই উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক সুলভ জ্ঞানের আদান-প্রদানের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং লক্ষ্য ছিল চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন।

ডাঃ লেভিন বিরল ও ভয়ঙ্কর রক্ত-ব্যাধিতে Rh উপাদানের প্রভাব আবিষ্কার করবার পর ডাঃ উইনার এ কাল ব্যাধি থেকে শিশুদের বাঁচাবার পন্থা খুঁজতে লাগলেন। ল্যাবরেটরি ও হাসপাতালে রোগীদের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিষম শোণিত মিশ্রণ-জাত শিশুদের রক্তে Rh উপাদান সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য আবিষ্কার করলেন!

ইতিমধ্যে ডাঃ উইনার বিয়ে করেছেন এবং দুইটি কন্যার বাবা হয়েছেন। এইবার অপত্য-স্নেহ-প্রভাবিত মন নিয়ে রক্ত-ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশুদের বাঁচাবার চিন্তায় গভীর ভাবে মনোনিবেশ করলেন।

ডাঃ লেভিনের আবিষ্কার কী করে হতভাগ্য শিশুদের বাঁচাবার কাজে লাগানো যায় সারাক্ষণ এই হল তাঁর একমাত্র চিন্তা। হাসপাতালের অন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে, বাড়িতে অবসর বিনোদনের জন্য পিয়ানো বাজাবার সময়, এমন কি স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে হয়ত সিনেমায় বসেছেন—সর্বত্রই এই চিন্তা তাঁর মন জুড়ে রয়েছে।

এ যাবত চিকিৎসকরা রক্তব্যাধিগ্রস্ত শিশুদের দেহে রক্ত সঞ্চার করেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা রক্তের Rh উপাদান ও তার বৈষম্যজনিত পরিণতি যা অজ্ঞাতসারে মাঝে মাঝে ঘটত, সে সম্বন্ধে মোটেই অবহিত ছিলেন না, ফলে এত চেষ্টা করেও রোগীদের বাঁচাতে পারেননি।

ডাঃ উইনার ব্রুকলিনের ইহুদি হাসপাতালে এই রোগগ্রস্ত নবজাত শিশুদের চিকিৎসায় বিশেষ নজর দিলেন। শিশু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই এবং বিষাক্ত রক্তপ্রবাহ দেহের কোন ক্ষতি করবার আগেই সূক্ষ্ম Rh উপাদানযুক্ত রক্ত সঞ্চারণ করতে লাগলেন।

এমনি ভাবে অনেকের প্রাণ বাঁচালেন, অনেককে সারাজীবন রুগ্ন ও পঙ্গু হয়ে থাকার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু এতেই তিনি খুশি নন। আরো যে অনেক বাকি রয়েছে।

মাঝে মাঝে একটি একটি শিশু এমনি মারাত্মক ব্যাধি নিয়ে জন্মে, সুষম Rh রক্ত সঞ্চারেও কোন ফল হয় না। অবশেষে ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে ডাঃ উইনার এদের বাঁচাবার একটি উপায় বের করলেন।

একটি সূক্ষ্ম সময়োপযোগী অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করে নবজাতকের শিরা থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত দূষিত রক্ত বের করে তার বদলে নতুন তাজা রক্তে ভরে দেওয়া। এই অতি সূক্ষ্ম রক্ত পরিবর্তনের কাজটি অত্যন্ত আস্তে আস্তে সম্পাদনের সময়ে শিশুর বুক ও শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হয়! ডাঃ উইনার ও তাঁর সহকারীদের চেষ্টায় নয়টি এই রকম মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত শিশু রক্ষা পেল। ১৯৪৪ সালের আগে জন্মালে, হতভাগ্যদের কিছুতেই বাঁচানো সম্ভব হত না। এখন এরা হয়ত কত বড় হয়েছে!

অন্যান্য জায়গাতেও সুচিকিৎসকগণ অনুরূপ পদ্ধতি বা নিজেদের উদ্ভাবিত সামান্য পৃথকপদ্ধতিতে এই সব শিশুদের প্রাণ রক্ষা করেছেন। য়ুইস মেমোরিয়্যাল হাসপাতালে ডাঃ ওয়ালারস্টিন দেড় বছরে এমনি মারাত্মক রোগগ্রস্ত সতেরটি শিশুর প্রাণ রক্ষা করেছেন। বোস্টনের চিলড্রেনস হাসপাতালে অনুরূপ সময়ে বারটি শিশু রক্ষা পায়। এমনি বছরের পর বছর আরো কত শিশু মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

ডাঃ লেভিন,প্রথম যিনি রক্ত ব্যাধির সঙ্গে Rh উপাদানের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন, আজকাল উৎসাহী তরুণদের রক্ত সম্বন্ধে

নানা তথ্য শিক্ষা দান করছেন, যাতে তারা ভবিষ্যতে উপযুক্ত চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক হতে পারে। তা ছাড়া এখনো নিজের গবেষণা নিয়ে অর্থোরিসার্চ ল্যাবরেটরিতে নিযুক্ত আছেন।

ল্যাবরেটরির কাজের শেষে অথবা অধ্যাপনার অবসরে তিনি ডাকটিকিট সংগ্রহ করেন বা সস্ত্রীক থিয়েটারে যান। তাঁর মেয়ে এবং দুই ছেলের কাছে সঙ্গী হিসেবে তিনি অতুলনীয়। তাঁর সান্নিধ্যলাভে সবাই খুশি। এই সব বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, যাঁদের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারে সবাই মুগ্ধ, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই যাঁদের অবদানে উপকৃত, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনেও তাঁরা সাধারণ মানুষের সমপর্যায়ে—স্ত্রী পু.. কন্যা নিয়েই তাঁদের ঘরোয়া জীবন।

এঁদের আবিষ্কারের ভিত্তিতেই নিত্যনতুন গবেষণার ফল পাওয়া যাচ্ছে। তার ওপর ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং সরঞ্জাম ও প্রয়োগ পদ্ধতির বহু উন্নতির ফলে রোগ নিরাময়ের বিভিন্ন উপায়ও নিত্য নতুন উদ্ভাবিত হচ্ছে।

———

জীবাণুর প্রতিষেধ ব্যবস্থা

যুবকের উন্নতির অভাবনীয় সুযোগ লাভ

আজকালকার নতুন আবিষ্কৃত আশ্চর্য সব ওষুধে মারাত্মক রোগও ভেল্কির মত সেরে যাচ্ছে দেখে আমরা হয়ত উৎফুল্ল হয়ে উঠছি, কিন্তু তার চেয়েও ভাল হয় যদি আগে থেকেই রোগের প্রাদুর্ভাব ঠেকানো যায়।

টিকা প্রতিবিষ-ইনজেকশন ও সিরাম প্রভৃতির প্রচলনে রোগ সংক্রমণ প্রতিহত হয়েছে এবং মারাত্মক রোগের ব্যাপক আক্রমণ থেকে সমস্ত সমাজ রেহাই পেয়েছে।

মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর আমেরিকায় হালে আমদানি হয়েছে; ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ ফেরত সৈন্যরা ইউরোপীয় সমর এলাকা থেকে নিয়ে আসে। অবশেষে রোগ মহামারির মত চারদিক ছড়িয়ে পড়ল। সেবার শীতকালীন প্রথম আক্রমণেই হাজার হাজার লোক মারা পড়ল, কেননা এ রোগটা নতুন বলে এ-দেশবাসী তখনো শরীরে প্রতিরোধ করবার উপযুক্ত শক্তি অর্জন করেনি। তা ছাড়া এটি হামের মত নয়, যা একবার হয়ে গেলে সহজে আক্রান্ত হবার আর সম্ভাবনা থাকে না। ১৯১৮ সালের পর থেকেই রোগের তীব্রতা কমে এল। মৃত্যুর হারও প্রথমবারের চেয়ে অনেক কমল। তবু কিছু না কিছু লোক মরতই। আর প্রতি বছর শীতকালে এই জ্বরের আক্রমণে অনেকে অশেষ কষ্ট পেত এবং বহু লোক নিতান্ত দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে যেত।

অনেকদিন থেকে এই রোগের প্রতিষেধের জন্যে ডাক্তাররা কোন টিকা অথবা সিরাম তৈরি করবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভেতর সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও কোন বৈজ্ঞানিক এ রোগের কোন জীবাণুব সন্ধান পাননি, অথবা এ রোগ প্রতিষেধক কোন টিকা তৈরি করতে পারেননি। তারপর, ১৯৪৪ সালে ডাঃ ওয়েনডেল স্ট্যানলি এবিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করলেন।

১৯০৪ সালে স্ট্যানলি ইণ্ডিয়ানার রিজফিল্ড নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ও সেখানেই শৈশব অতিবাহিত করেন। তাঁর পিতামাতা স্থানায় একটি সংবাদপত্রের মালিক ছিলেন। বালক ওয়েনডেল ইস্কুলের ছুটির পর ও গরমের ছুটিতে এই কাগজের আফিসে বাবা মাকে সাহায্য করতেন—কখনো হয়ত টাইপ সাজাতে কখনো বা প্রেস-মেসিনে কাগজ ছাপাতেন, কখনো বা সংবাদ যোগাড় করতেন, কখনো গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি কাগজ বিলি করে আসতেন।

তার বয়স যখন ষোল, তখন থেকেই তাঁরা এসে রিচমণ্ড-এ বাস করতে লাগলেন। এখানে ইস্কুলের পড়া শেষ করে ওয়েনডেল স্ট্যানলি আর্লহাম কলেজে ভর্তি হন। খেলাধূলায় তার বরাবরই নাম ছিল। এবার কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়দের অন্যতম বলে গণ্য হলেন। কিন্তু পড়াশুনায় তেমন সুবিধা হচ্ছিল না। কেবল রসায়ন ও গণিতে ভাল ফল হত, কেননা ও দুটিতে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তা সত্ত্বেও ফুটবল খেলা নিয়ে এত বেশি মেতে উঠতে লাগলেন যে পড়াশুনায় যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত ততটা দেওয়া হয়ে উঠত না। কলেজের শেষ বছরে তিনি ফুটবল ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হলেন এবং সারা ইণ্ডিয়ানা রাষ্ট্রের কলেজগুলির

প্রতিনিধিমূলক দলেও একজন খেলোয়াড় বলে নির্বাচিত হলেন। এই সবে অতিরিক্ত মত্ত হয়ে ঠিক করে বসলেন খেলাধুলা— বিশেষ করে ফুটবল খেলাকেই জীবনের অবলম্বন হিশেবে গ্রহণ করবেন এবং এই খেলার শিক্ষক হবেন।

তারপর হঠাৎ একদিন উরবানায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গিয়ে সেখানকার রসায়নের প্রধান অধ্যাপক রজার অ্যাডামস-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাব জমে গেল এবং রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। একজন হলেন রসায়নের অধ্যাপক—ঐ তার ধ্যান-জ্ঞান, আর অন্যজনের কাছে সেটি একান্ত কৌতূহলের বস্তু। ডাঃ অ্যাডামস-এর কাছে আবার বিষয়টি ছিল খেলার মত, এমনকি খেলার চেয়েও উন্মাদনাপূর্ণ। আর তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি তীব্র আকর্ষণের ছোঁয়াচ লাগল তরুণ ওয়েনডেল-এর মনে। ওয়েনডেল আর ডাঃ অ্যাডামস-এর কথা আর যেন ফুরোয়ই না। অবশেষে চলে আসবার আগে স্ট্যানলি করলেন কি, অ্যাডমস-এর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালীন ক্লাসে রসায়ন পড়বেন বলে ভর্তি হয়ে গেলেন।

আর্লহাম কলেজের শিক্ষা শেষ করে ওয়েনডেল ডাঃ অ্যাডমস-এর কাছে জৈব ও প্রাকৃতিক রসায়ন (Organic and Physical Chemistry) এবং সেই সঙ্গে জীবাণু-তত্ত্ব (Bacteriology) পড়তে লাগলেন। এইবার ওয়েনডেল স্ট্যানলির প্রকৃত প্রতিভা প্রকাশ পেতে লাগল। চার বছর উচ্চতর বিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণের সময় তাঁর কাজের উৎকর্ষ দেখে তাঁকে একজন সহকারী শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে নির্বাচন করা হল।

তাঁর ক্লাসেই মেরিয়ন জে নামে একজন ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হল এবং অন্তরঙ্গতা বেড়ে উঠল। ১৯২৮ সালে ওয়েনডেল স্ট্যানলি

ডক্টর উপাধিতে ভূষিত হলেন ও ডুপণ্ট-গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করতে লাগলেন। একবৎসর পরেই বৃত্তি নিয়ে জার্মানির মিউনিক শহরে গেলেন। সেখানে অন্যান্য ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত হলেন।

১৯৩১ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলেন এখানে নিউইয়র্কের রকফেলার ইনস্টিটিউট-এ ও নিউজার্সির গবেষণাগারগুলিতে কাজ করতে লাগলেন। তাঁর সহ-বিজ্ঞানী বন্ধুরা তাঁর উদ্ভাবন ও পরীক্ষা কার্যে অপ্রতিহত গতি লক্ষ করে প্রশংসা না করে থাকতে পারতেন না।

রকফেলার ইনস্টিটিউটে তখন ভাইরাস নিয়ে গবেষণা হচ্ছিল। এই ভাইরাসগুলি রোগের সূক্ষ্মতম বীজাণু। এগুলি যেসব রোগের কারণ তার একটি হল ইনফ্লুয়েঞ্জা। এদের প্রকৃতি এমনি যে, এই কিছুদিন আগেও এর কোনটির স্বরূপ অনুবীক্ষণের সাহায্যেও ধরা পড়েনি। তখন বৈজ্ঞানিকরা তাদের চেহারা, জীবনধারণ-পদ্ধতি এসব সম্বন্ধে একটুও জানতেন না। এই কারণে ভাইরাস উৎপন্ন ব্যাধি সারানো খুবই কঠিন ছিল।

রকফেলার ইনস্টিটিউটের ডাঃ ফ্লেক্সনার ও ডাঃ কুনকেল এই বীজাণুগুলিকে জীবতত্ত্ববিদের দৃষ্টি অপেক্ষা রসায়ন-বিদের দৃষ্টিতেই দেখতেন, আর এপর্যন্ত এই ভাবেই গবেষণা হয়ে এসেছে। এই গবেষণায় ডাঃ স্ট্যানলি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন।

এই গবেষণায় সাফল্যের পথে যে সব অন্তরায় ছিল সেগুলিকে তিনি জয় করতে প্রাণপণ পরিশ্রম করে ও অবশেষে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কার করলেন—কতিপয় ভাইরাসকে তিনি রঞ্জিত করবার উপায় বার করলেন এবং

ফলে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ সাহায্যে তাঁদের নির্ধারণ করা সম্ভব হল। তিনি এই জৈবিক বীজাণুগুলির স্বভাব ও ধরন-ধারণ সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য আবিষ্কার করলেন, ফলে সজীব পদার্থ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাও বদলে গেল। তাঁর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় স্প. ধরা পড়ল—এই ভাইরাস বীজাণুগুলি নির্জীব জড় পদার্থ ও সজীব প্রাণীর মধ্যস্থ একপ্রকার অভিনব বস্তু। এর আগে কেউ ভাবেনি এ ধরণের কোন পদার্থ থাকতে পারে! এই অভাবনীয় আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তিনি বিশেষ সম্মানিত ও যশস্বী হলেন।

১৯৩৯ সালে তিনি মেরিয়ন জে-কে বিয়ে করলেন। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়েই তার সঙ্গে আলাপ ছিল। পরম সুহৃদ ও তৎকালীন শিক্ষক ডাঃ রজার অ্যাডমস এই বিবাহে মধ্যস্থতা ও অভিভাবকত্ব করলেন।

এদিকে ভাইরাস সম্পর্কে ডাঃ স্ট্যানলির গবেষণা ও পরীক্ষা এগিয়ে গেল। কয়টি তরুণ তাঁর ল্যাবরেটরিতে সহকারীরূপে কাজ করছিল। এই তরুণ বৈজ্ঞানিকরা এখান থেকে মারাত্মক ভাইরাস সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে গেল। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যত্র গিয়ে ভাইরাস গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করলেন। এইভাবে ভাইরাস সম্পর্কে জ্ঞান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ডাঃ স্ট্যানলি ও তাঁর পত্নী চারিটি সন্তান লাভ করলেন—একটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। তাঁরা নিউ জার্সিতে রকফেলার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি জায়গায় বাস করতে লাগলেন। ডাঃ স্ট্যানলি তাঁর গবেষণা নিয়ে পরম সন্তোষের সঙ্গে ডুবে রইলেন।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল। সেনাবাহিনীর চিকিৎসা-বিভাগকে অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে সেনাদলের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার

জীবাণু সংক্রমণ নিবারণের মাথা ঘামাতে হয়। তাঁরা ভাইরাস গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রবর্তী অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ডা. স্ট্যানলির শরণাপন্ন হলেন—যদি তিনি সৈনিক ও নাবিকদের এই রোগ সংক্রমণ থেকে বাঁচবার কোন উপায় বের করতে পারেন।

ডাঃ স্ট্যানলিও নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে যুদ্ধ-সহায়ক কাজে নিয়োগ করবার জন্যে ইচ্ছুকই ছিলেন,তাই তিনি এই আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করলেন। ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণু গবেষণা করে, তার টীকা আবিষ্কারের জন্য তিনি একটা সংস্থা স্থাপন করলেন। বহু কঠোর শ্রমসাধ্য গবেষণার পর তিনি কতকগুলি তথ্য আবিষ্কার করলেন এবং টিকা তৈরি করতে সমর্থ হলেন।

১৯৪৫ সালে এই টিকা প্রযোগোপযোগী হল। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয ও সৈন্যদলে সবসুদ্ধ বার হাজার লোকের ওপর এই টিকা প্রযোগ করে ফল পাওয়া গেল। যে সব দলে এই টিকা দেওযা হয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ বিরল হযে গেল, দু-একজন যাদের হয়েছিল সেখানে মোটেই গুরুতর রকমের হযনি। যাদের টিকা দেওযা হযনি তাদের মধ্যে পূর্বোক্ত দলের চেযে ছয় গুণ বেশি লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ছিল। তার মধ্যে অনেক মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হযেছিল। টীকা নেওয়া রোগীদের মধ্যে কেউই গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হয়নি।

এই নতুন টিকার বহুল প্রচলনে মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জার ব্যাপক সংক্রমণ ত কমে যাবেই, চাইকি কয়েক বছরের মধ্যেই এর প্রাদুর্ভাব চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ডাক্তার ওয়েনডেল স্ট্যানলি যিনি ১৯২০ সালে ডাঃ রজার অ্যাডামস-এর প্রতিভার সান্নিধ্যে এসে বৈজ্ঞানিক জীবন বেছে নিয়েছিলেন, কৃতকর্মা হয়ে জীবনে বহু পুরস্কার ও পদক পেলেন।

তাঁর ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা অধুনা আবিষ্কৃত রোগ প্রতিষেধকগুলির অন্যতম। আর তাঁর ভাইরাস সম্পর্কিত গবেষণাই ক্যান্সার, পোলিও প্রভৃতি ভাইরাস সৃষ্ট ব্যাধির ওষুধ আবিষ্কার করার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

আক্রমণকারীদের মধ্যে

গুলি-বারুদ, অস্ত্র-শস্ত্রের উদ্ভাবক ও নির্মাতারা যেমন যোদ্ধাদের সমরোপকরণ যোগায়, তেমনি বৈজ্ঞানিকরা নতুন নতুন রোগ-প্রতিষেধ-টিকা আবিষ্কার করে ডাক্তাদের হাতে মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে যুঝবার অস্ত্র তুলে দেন।

টিকা ও সিরাম আমাদের অনেকের কাছেই বিস্ময়ের বস্তু এবং অনেকেই এ সম্পর্কে আদৌ কিছু জানে না বলে টিকা নিতে ভয় পায়। এরা আমাদের শ্রেষ্ঠ জীবন রক্ষক।

কতকগুলি রোগে বেশ দুর্বলীকৃত জীবাণু দ্বারা টিকা দেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন ব্যক্তির শরীরে খুব মৃদু অথচ ক্ষতিকর না হয় এমন রোগ-বীজাণু প্রবেশ করানো হয়। ফলে সামান্য ভুগে শরীরে ঐ রোগের একটা প্রতিরোধ বা প্রতিষেধ ক্ষমতা আপনি অর্জিত হয়। কয়েকটি রোগে অবশ্য পদ্ধতিটি একটু অন্য রকম। যেমন, ডিপথিরিয়া ও লাল-জ্বরে (scarlet fever) ঠিক জীবাণু না নিয়ে জীবাণুই একটা উপাদান থেকে তৈরি করা হয়।

এই রোগ প্রতিষেধের আর একটি পদ্ধতি হল অনাক্রম্য-সিরাম অর্থাৎ এই সিরাম এমন কোন প্রাণীর দেহ থেকে নেওয়া হয় (মনুষ্য শরীর থেকে কদাচিৎই গৃহীত হয়), যে প্রাণী এই রোগে একবার আক্রান্ত হয়ে সেরে উঠেছে ও তার ফলে তার শরীরে ঐ রোগ প্রতিরোধের একটা ক্ষমতা জন্মে গিয়াছে। এই প্রতিষেধক

সিরাম কোন ব্যক্তির শিরায় ইনজেকশন দ্বারা প্রবিষ্ট করানো হয় ও এই ভাবে তার শরীরে ঐ রোগ প্রতিরোধের একটা ক্ষমতা তৈরি করে দেওয়া হয়। কতকগুলি সিরাম রোগের সংক্রমণ বা ছোঁয়াচ-লাগার ভয় থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, আর কতকগুলি দেওয়া হয় ইতিমধ্যেই শরীরে যে জীবাণুগুলি রয়েছে তাদের জয় করার জন্যে। কিন্তু সব রোগেই মানুষ বা পশুর শরীর প্রতিরোধ শক্তি সম্পন্ন হতে পারে না। কাজেই অনাক্রম্য সিরাম নির্দিষ্ট কয়েকটি রোগের ক্ষেত্রেই পাওয়া সম্ভব।

টিকা এবং সিরাম মাত্র কয়েকটি সাংঘাতিক রোগের জন্যেই তৈরি করা সম্ভব হইয়াছে। এই টিকা সিরাম ইত্যাদি তৈরি করা কঠিন কাজ, এর কোন কোনটি তৈরি করতে বৈজ্ঞানিকদের দশ, বিশ, এমনকি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত খাটতে হয়েছে, পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে প্রকৃতই কার্যকরী কিনা এবং দেহে কোন প্রতিক্রিয়া অথবা পরিণামে ফল খারাপ হয় কিনা। প্রত্যেকটা রোগের টিকা বের করা এক একটা আলাদা আলাদা জটিল সমস্যা বলা যায়। আর যে বৈজ্ঞানিকরা তা সমাধান করে কৃতকার্য হয়েছেন তাঁদের চিন্তাশক্তির চমৎকারিত্ব অতুলনীয, অসীম ধৈর্য ও অনলস অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

মনুষ্য-শরীরকে রোগ প্রতিরোধকারী ক্ষমতাবিশিষ্ট করার জন্যে প্রথম টিকার আবিষ্কার হয় ইউরোপে ১৭৯৬ সালে। তখনকার দিনে বসন্তরোগ সভ্যজগতের একটি বিভীষিকা ছিল। এই মহামারির প্রাদুর্ভাব বছরে পর বছর হত আর দেখা গেল বছর পঁচিশের ভিতর ১৫ লক্ষ লোক সাবড়ে দিয়েছে, এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েও যারা ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে উঠল তারা হয় চিরজীবনের মত অন্ধ অথবা কুৎসিত দাগ-কলঙ্কিত হয়ে রইল।

ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার বলে একজন ইংরেজ চিকিৎসক লক্ষ করলেন, যারা গো-বসন্তে ভুগেছে তাদের যেন বসন্ত প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা জন্মে। গো-বসন্ত বসন্তের চেয়ে কম মারাত্মক রোগ। তিনি গো-বসন্তের বীজ দিয়ে এক প্রকার টিকা তৈরি করলেন, কিন্তু রোগ প্রতিরোধের ধারণা ইউরোপীয়দের কাছে তখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কাজেই তাদের বিশ্বাস জন্মাতে বেশ কয়েক বৎসর লাগল। অবশ্য কালক্রমে চিকিৎসকরা এ পদ্ধতিটা গ্রহণ করলেন এবং টিকার সাহায্যে অনেকেরই জীবন বসন্তের করাল কবল থেকে রেহাই পেতে লাগল।

ডাঃ জেনার তার টিকাটি তৈরি করেছিলেন সম্পূর্ণ কার্যকারণ ও গুণাগুণ একরকম না জেনেই। ওটা প্রযোগ করে তিনি ফল পেয়েছিলেন সেই বাহ্যিক ফল দেখেই তিনি ওটা তৈরি করলেন—বসন্তের জীবাণুর খবর জানতেন না। সে যুগে জীবাণু থেকে যে রোগের উদ্ভব হয়, কারো জানা ছিল না। কাজেই অজ্ঞাত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ভয়ানক শক্ত ছিল সন্দেহ নেই।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রতিষেধ ওষুধের বিশেষ উন্নতি হয়নি। তারপর পাস্তর, কক, অলিক প্রভৃতি কতিপয় মহাবিজ্ঞানীর আবিষ্কার নতুন যুগের দ্বার খুলে দিল।

লুই পাস্তর ফ্রান্সের একজন রসায়ন বিজ্ঞানী ছিলেন। গবেষণা করতে করতে তার বিশ্বাস হল জীবাণু থেকেই রোগের উদ্ভব হয়। তিনি পাগলা কুকুরের হাবভাব লক্ষ করতে লাগলেন, দষ্ট স্থান থেকে জীবাণু মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। পরীক্ষান্তে তিনি দেখলেন জীবাণু যখন মস্তিকে গিয়ে ওঠে তখনই দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। তিনি একটি বিশেষ টিকা তৈরি করিলেন,—দংশনের অল্প একটু পরেই প্রয়োগ করলে তা জীবাণুগুলিকে মস্তিষ্কে পৌছবার আগেই রোধ

করে দেয়। এ দিয়ে পাগলা কুকুরে কামড়ানো রোগীকে বাঁচাবার উপায় হ'ল।

প্রসিদ্ধ জার্মান বৈজ্ঞানিক রবার্ট কক জীবাণু সম্বন্ধে আরো কতকগুলি মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখলেন ভিন্ন ভিন্ন রোগের বীজাণু সম্পূর্ণ আলাদা জীবাণু দিয়ে তৈরি, তাদের জয় করতে হলে আলাদা আলাদা উপায় অবলম্বন করতে হবে। তিনি কলেরার একটি টিকা আবিষ্কার করলেন। তাঁর ল্যাবরেটরিতে বেরিং নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক কাজ করছিলেন। তিনি ডিপথিরিয়ার টিকা তৈরি করলেন।

পল আলিক জীবাণুর রহস্য ও উচ্ছেদোপায় সম্বন্ধে অনেক সন্ধান দিলেন। মনুষ্য-শরীরে প্রতিষেধ ক্ষমতা উদ্ভব হয় সে সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জগতে এক অভিনব অবদান।' তখনকার দিনে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যে কারো বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু আজকালকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিক তাঁর প্রদর্শিত পথেই গবেষণা করছেন। তাঁদের বিশ্বাস আলিকের তথ্য বিজ্ঞানকে জীবাণু রহস্য উদ্‌ঘাটনে ও মানবদেহে প্রতিবোধশক্তির উপায় উদ্ভাবনে অনেক সহায়তা করবে। আলিক ১৯১৪ সালে মারা যান। তারপর এযাবত অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা প্রতিষেধ ক্ষমতাসম্পন্ন দ্রব্যের অনেক উন্নতি করেছেন কিন্তু কাজ খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। কেননা, বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন জীবাণুর আকৃতি প্রকৃতি স্বভাব ইত্যাদি ভয়ানক জটিল। অনেক রোগের আজ পর্যন্ত কোন টিকা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তবে গত কয়েক বৎসরের ভেতর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর কিছুটা চমকপ্রদ অগ্রগতি হয়েছে। ইতিমধ্যে টিকা ও সিরাম যা আবিষ্কৃত হয়েছে ভবিষ্যতে এর থেকেই আশাতীত এবং অচিন্তনীয় উন্নতি সম্ভব হবে।

এমনও আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে মারাত্মক ক্ষয়রোগের জীবাণুও একদিন উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে। কয়েক শতাব্দী ধরে এই রোগ-বীজাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলেছে কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য হয়নি। অধুনা আবিষ্কৃত স্ট্রেপ্টোমাইসিনই শুধু যে আমরা পেয়েছি ত নয়, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে (১৯৪৭ সালে) যে, কয়েক প্রকারের যক্ষ্মারোগ টিকা দ্বারা প্রতিষেধ করা সম্ভব। এই যক্ষ্মা টিকার আমদানি হয়েছে ফ্রান্স থেকে। এর নাম হল বি সি. জি. টিকা অর্থাৎ পাস্তুর ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক কালমেত ও গেরিন যে ব্যাসিলি আবিষ্কার করেছিলেন তদনুসারে এই নামটা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এই প্রকারের একটি টিকা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সাল থেকে চেষ্টা করছিলেন। ১৯৩৪ সালে প্রাণীদের ওপর ওষুধটি প্রয়োগ করে এমন সুফল পেলেন যে নিরাপদে মনুষ্যদেহে প্রয়োগ করতে সাহসী হলেন। শিকাগোর ডাঃ এস. এস. রোজেনথল এই সিরামটির বিবরণ পেয়ে সেই বছরই তিনি ফ্রান্সে গেলেন ব্যাপারটা বিশদভাবে জানতে। তিনি ঐ সিরামের খানিকটা নমুনা নিয়ে ফিরলেন ও তাই দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রথম মানুষের শরীরে ঐ টিকা প্রয়োগ করলেন।

এই টিকার কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে হয় খুব ধীরে ধীরে ও অনেক সময় নিয়ে। প্রথমত নতুন কোন টিকা পরীক্ষা করবার সময় ডাক্তাররা এমন রোগীর ওপরই তা প্রয়োগ করেন, যার রোগ অতি মারাত্মক ও দুরারোগ্য।

দ্বিতীয়ত এই টিকা প্রয়োগের ফলাফল লক্ষ করতে হয়—শুধু এক-আধ সপ্তাহ বা মাসখানেক, কিংবা বছর খানেক নয়, রোগ সেরে যাওয়ার বহু বৎসর পর পর্যন্তও রোগীর প্রতি

সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। তাছাড়া দেখতে হয় টিকা দেওয়ার ফলে শরীরে প্রতিরোধ-শক্তি গড়ে উঠছে কিনা অথবা কোনপ্রকার প্রতি-ক্রিয়া হচ্ছে কিনা! যদি দৈবাৎ দেখা যায় ওষুধটি প্রতিক্রিয়ামূলক তখন ঐ সিরাম সংশোধন ও অন্যান্য উন্নতির সাহায্যে দোষটি শোধরাবার চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া কী পরিমাণে কতক্ষণ অন্তর ওষুধটি ব্যবহার করলে সঠিক ফল পাওয়া যাবে তা প্রয়োগ দ্বারা বুঝে অব্যর্থ মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়।

বহু বৎসর ধরে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকরা ও যুক্তরাষ্ট্র-পাবলিক হেল্থ সার্ভিসের অধীনে অন্তর্গত কলম্বাস ল্যাবরেটরির গবেষকরা এই সিরামের ওপর গবেষণা করছেন ও উন্নতি করতে সমর্থ হয়েছেন। যক্ষ্মারোগ প্রতিষেধের অন্য পদ্ধতি বের করবার জন্যেও অবিরাম গবেষণা চলছে। এই বি. সি. জি. টিকা এখন প্রয়োগ করবার ঠিক উপযুক্ত হয়েছে এবং এই মারাত্মক ব্যাধি দমনে সহায়ক হবে।

সম্মিলিত প্রচেষ্টা

কেবল যক্ষ্মা নয়, কর্কট রোগ (ক্যান্সার), পোলিও (শিশুদের পক্ষাঘাত) ও অন্যান্য মারাত্মক রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে কতকগুলি সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে। এদের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও হাসপাতালের অন্তর্ভুক্ত ল্যাবরেটরি-সমূহে গবেষণার জন্যে টাকা দেওয়া হয়।

এই রকম ফাণ্ড-এর দ্বারা যে সব গবেষণা চলছিল তাদের মধ্যে একটি হল বিভ্রান্তকারী মারাত্মক পোলিও ভাইরাস অনুসন্ধান এবং কী করে এর কবল থেকে রেহাই পাওয়া যায়! বাল্টিমোরের ডাঃ ডেভিড বোডিয়ান ও ইয়েলের ডাঃ ডরোথি হর্স্টম্যান-এর

আবিষ্কার প্রথম বৈজ্ঞানিকদের ভালভাবে হদিস দিল কী ভাবে এই জীবাণু দেহে প্রবেশ করে ও কী ভাবে দেহ নষ্ট করে।

জন হপকিন্স পোলিওমাইলিটিস গবেষণা কেন্দ্রের ডাঃ বোডিয়ান ও ডাঃ হাওয়ার্ড হাউ ১৯৪৭ সালে একটি সিরাম তৈরি করলেন, তার ফল বেশ লক্ষণীয়। পোলিও সম্বন্ধে যাঁরা এযাবত গবেষণা করছিলেন তাঁরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতার বারি ঢেলে যেন একটি সাধারণ জ্ঞান সরোবর বৃদ্ধি করছিলেন। ক্রমশ এইসব গবেষণা থেকে জানা গেল, পোলিও ভাইরাস শুধু একপ্রকারের নয়—অমন শত শত বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতির। তবে তাদের মোটামুটি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলা হল ।

হার্ভার্ডের ডাঃ জন এণ্ডারস-এর বিজ্ঞানী দল বানরের মূত্রাশয় থেকে পোলিও সিরাম তৈরি করবার অভিনব পন্থা আবিষ্কার করলেন। এই আবিষ্কারে সিরাম তৈরি আরো খানিকটা এগিয়ে গেল ।

এদিকে পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস গবেষণা-ল্যাবরেটরিতে ডাঃ জোনস সল্ক কাজ করছিলেন। তিনি বানরের আক্রান্ত মূত্রাশয়-তন্তু থেকে একটি সিরাম তৈরি করলেন এবং তাতে তিনটি প্রধান শ্রেণীর পোলিও-র প্রত্যেকটিই উপাদান স্বরূপ মেশালেন যাতে প্রত্যেক রকম প্রতিষেধ শক্তিই লাভ করা যায়। এগুলিকে আবার ফর্মালডিহাইডি সলিউশনে ফেলে নিষ্ক্রিয় করে নিলেন। তারপর আবার উক্ত সলিউশনে মন্দ প্রতিক্রিয়া দূর করবার জন্যে সোডিযাম বাইসালফাইট ব্যবহার করলেন। অবশেষে দেখা গেল, এ সিরামগুলি জীবাণু মেরে না ফেললেও এমন দুর্বল করে দেয় যে আর রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। তখন শুধু শরীরে ঐ রোগের প্রতিষেধক স্বরূপ একটি শক্তি তৈরি

করে। প্রথমে পশুর ওপর এবং পরে মানুষের দেহে প্রয়োগ করে দেখা গেল ডাঃ সল্ক-এর টিকা কোন রকম বিপজ্জনক নয়, অথচ প্রতিষেধ হিসেবে বেশ কার্যকরী। তারপর পাঁচটি বৃহৎ ভৈষজ উৎপাদক ব্যবসায়ী এ ওষুধ তৈরি করতে শুরু করল। প্রতি ট্যাঙ্ক তৈরি ওষুধ ডাঃ সল্ক-এর ল্যাবরেটরিতে, ওষুধ উৎপাদকদের দ্বারা এবং মেরী ল্যাণ্ডের বেথেজডায় ইনস্টিটিউট অব ন্যাশানাল রিসার্চ-এর দ্বারা বিশদভাবে পরীক্ষা করা হল।

বসন্তকালের প্রথম দিকে পোলিওর প্রাদুর্ভাব হয়। ১৯৫৪ সালের বসন্তের প্রাক্কালে স্কুলের নিম্ন তিন শ্রেণীর পাঁচ থেকে দশ লক্ষ শিশুদের পোলিও-টিকা দিয়ে দেওয়া হল। এই সব শিশুদের বাপ-মা ছেলেদের বাঁচাবার আগ্রহে টিকা দিতে অনুমতি দিলেন। গ্রীষ্মের শেষে দেখা গেল পোলিও রোগী শতকরা চল্লিশ ভাগ কমে গিয়েছে। কিন্তু কয়েক বছর এই শিশুদের ওপর লক্ষ রাখতে হবে। যথাযথ বিবরণ রাখতে হবে, যাচাই করে দেখতে হবে সত্যি সত্যি টিকা লওয়া কতটুকু কার্যকরী হবে।

অন্যান্য গবেষক-বিজ্ঞানীও এবিষয়ে পৃথক পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছেন এবং তাঁদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান একত্র করা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে একটি অব্যর্থ সিরাম তৈরি করা সম্ভব হয়।

সম্প্রতি হুপিং-কাশি ও ডিপথিরিয়া দুই-ই আরোগ্য করে এমন একটি অভিনব টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। সবাই জানেন ডিপথিরিয়া কী ভয়াবহ ব্যাধি, আর প্রতিরোধার্থে একটি টিকা বহুদিন থেকে প্রচলিত আছে। কিন্তু হুপিং কাশিটাকে কেউ বড় একটা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু খবর নিয়ে জানা গেছে এই কাশিতে প্রতি বছর পাঁচ হাজার শিশু গত কয়েক বছর ধরে মারা যাচ্ছে। আর যে

কয়েক হাজার এই রোগে আক্রান্ত হয়ে সেরে উঠেছে তাদের অনেকেই বিকলাঙ্গ বা শারীরিক নানা অসুস্থতায় ভুগছে। হুপিং কাশি ও ডিপথিরিয়ার নতুন টিকা আবিষ্কার হওয়ায় অনেকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে, অনেকে জীবনভোর পঙ্গু দেহ বহন করবার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে।

টাইফাস রোগ যুক্তরাষ্ট্রে নেই বললেই হয়। এখানকার স্বাস্থ্য-বিষয়ক আইন ও স্বাস্থ্য বিভাগের কড়া তত্ত্বাবধানে এ রোগ এখানে সুবিধা করতে পারে নি। দারিদ্র্য ও তজ্জনিত অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে বাস করার ফলেই সাধারণত এ রোগ হয়ে থাকে। এর সংক্রমণ হয় উকুনের দ্বারা। এই ব্যাধি এখনো ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশেরই বিষম সমস্যা হয়ে রয়েছে। গত কয়েক শতাব্দী ধরে এই রোগে কত কোটি লোক মারা গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

গত প্রথম মহাযুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপের রণাঙ্গনে নিহতদের চেয়ে তুরস্ক ও বলকান অঞ্চলে অনেক বেশি লোক মারা গিয়েছিল এইরোগে। তিন কোটি লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারমধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ লোক মারা পড়ল। মৃত্যু সংখ্যা লক্ষ করে এবং পাছে এই রোগটি দেশে সংক্রমিত হয় তাই দেশবাসীকে রক্ষা করবার জন্যে আমেরিকান সরকার একটি বেশ জোরালো কার্যকরী টিকার প্রয়োজন বোধ করলেন। তা ছাড়া যুদ্ধের সময় একটি ওষুধ হাতের কাছে প্রস্তুত থাকা দরকার, কেননা যুদ্ধের জন্যে এ দেশের সৈন্যদের সাগর পার হয়ে ঐসব টাইফাস অধ্যুষিত অঞ্চলেও যেতে হতে পারে।

এই সব ভেবে চিন্তে সরকারি ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা টাইফাস প্রতিষেধক কিছু বের কববার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন।

১৯৩৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র হেলথ সার্ভিসের ডাঃ হ্যারল্ড কক্স টাইফাস প্রতিষেধক একটি টিকা বের করতে সমর্থ হলেন।

তাঁর ল্যাবরেটরিতে তিনি ও তাঁর সহকারী ছয়দিন যাবত কৃত্রিম উপায়ে তা দেওয়া মুরগির ডিমে সূচ দিয়ে একটি করে ছিদ্র করে দিলেন আর তার ভেতরে টাইফাস জীবাণু ইনজেকশন করে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে ছিদ্রগুলি বন্ধ করে দিলেন। তারপর ডিমগুলি আবার ইনকিউবিটার যন্ত্রের মধ্যে পুরে আরো কয়েকাদন রাখলেন। ডিমের ভেতর টাইফাস জীবাণু কুসুম খেয়ে আকারে ও সংখ্যায় বাড়তে থাকল। এইভাবে চমৎকার ও সমৃদ্ধ জীবাণুর একটি চাষ সম্ভব হল।

তারপর ডাঃ কক্স ডিমগুলি ভেঙে ভেতরকার বর্ধিত জীবাণুগুলি বের করে নিলেন। এই দিয়ে তিনি টিকা তৈরি করলেন এবং অনেকগুলি পশুর দেহে প্রয়োগ করে দেখলেন টাইফাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তাদের অন্য কোন ক্ষতি না হয়। টিকা দেওয়ার পরে বেশি মাত্রায় মারাত্মক টাইফাস জীবাণু প্রয়োগ করা হল। কিন্তু আশ্চর্য তাদের কিছুই হল না! টিকাই তাদের বাঁচিয়ে রাখল!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকান সেনাদলে এই টিকারই পরিমার্জিত সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছিল।

বিদেশে—কিছুদিন আগেও যে সব অঞ্চল টাইফাস অধ্যুষিত ছিল, সেখানে সৈন্যদের পাঠাবার আগে টাইফাস টিকা দিয়ে দেওয়া হল। উকুনবাহিত জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধে এই টিকা প্রয়োগ এবং উন্নত স্বাস্থ্যনীতি পালনে খুবই কার্যকরী হয়েছিল।

ওষুধের জগতে আর একটা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল গামা গ্লোবুলিন। এই কিছুদিন আগে হার্ভার্ড মেডিক্যাল-স্কুলের ডাঃ এডুইন কন এটি তৈরি করেন। সে কাহিনীও বেশ মজার।

আমাদেরই রক্তে তৈরি ওষুধ

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, এই সেদিনও সবার ধারণা ছিল হাম-জ্বর যা সাধারণত বড়দের চেয়ে ছোট বাচ্ছাদেরই বেশি হয়ে থাকে, অতি সামান্য অসুখ। অবশ্য জানা ছিল, একবার কারো হাম হলে বহুদিন পর্যন্ত—এমন কি কোনদিনই আর হবে না। যেহেতু হাম একবার হলে আর হত না, আর ছেলেদের জীবনে একবার না একবার হাম হবেই, প্রাচীনপন্থীরা তাই ছেলেদের একজনের কারো হাম হলে রোগীকে আলাদা করে না রেখে একই ঘরে—এমন কি এক বিছানাতেই শুতে দিতে ইতস্তত করতেন না। বরং বাপ-মা ভাবতেন—ক্ষতি কী, হয়ে যাক না সবারই একবার!

কিন্তু এই শোচনীয় অজ্ঞতার ফলে অনেক সময় অনেক শিশুর সমূহ বিপদ হত। কারণ হাম থেকে অনেক সময় এমন জটিল ব্যাধি দাঁড়িয়ে যেতে পারে যা বড়ই ক্ষতিকর। এতে শারীরিক পঙ্গুতা বা কোন অঙ্গহানিও ঘটতে পারে। দু-বছরের নিচের শিশুদের পক্ষে হাম মারাত্মক রোগ।

গত বছর বিশেকের বেশি হল জানা গেছে যে, হাম ভয়ানক মারাত্মক ব্যাধি, এবং তখন থেকেই চিকিৎসকরা এর সংক্রমণ প্রতিষেধমূলক টিকা আবিষ্কারে নিরত ছিলেন। কিন্তু গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত কোন কার্যকরী টিকা বা এমন কিছু আবিষ্কার হয়নি যার প্রয়োগে দেহের কোন ক্ষতি হবে না। অবশেষে সেই বহু আকাংক্ষিত টিকা আবিষ্কৃত হল। কিন্তু সরাসরি হামের টিকা খুঁজতে গিয়ে অবশ্য বের হয়নি, অন্যভাবে বেরিয়ে পড়ল।

ইউরোপে সংগ্রাম যত তীব্র হয়ে উঠতে লাগল আমেরিকান সেনাদলে ততই যুদ্ধাহতের শরীরে রক্ত-সঞ্চারের জন্য যথেষ্ট রক্ত মজুত রাখার প্রয়োজন অনুভূত হল। অথচ এত রক্ত লোকের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে পাওয়া যাবে তারও ভরসা নেই। কাজেই বৈজ্ঞানিকরা ভাবছিলেন, গবাদি পশুর রক্ত বা তা থেকে উৎপন্ন কোন পদার্থ রক্তের অভাব পূরণ করতে পারে কিনা।

ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের কাজই হল সামরিক প্রয়োজনে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা। কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষ হার্ভার্ডের ডাঃ কনকে এই গবেষণার ভার নিতে অনুরোধ জানালেন। কারণ তিনিই রক্ত বিষয়ে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের অন্যতম।

কয়েক বছর ধরে তিনি রক্তের উপাদানগুলি বিশ্লেষমূলক ভাগে ভাগ করে তাদের পৃথক করার চেষ্টা করছিলেন, যাতে শরীরের বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতা বুঝতে পারা যায়। এতদিন পরে তিনি কৃতকার্য হলেন। এ কাজে অসাধারণ জ্ঞান ও অভাবনীয় মৌলিক চিন্তাশক্তির প্রয়োজন, কারণ প্রক্রিয়া প্রণালী কঠিন ও খুবই জটিল। গবাদি পশুর রক্ত বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন উপাদানের পরীক্ষার পর তিনি জানালেন এদের রক্ত বা রক্তের কোন উপাদান দিয়ে মনুষ্য রক্তের অভাব পরিপূরণ সম্ভব নয়। সৌভাগ্যবশত আমেরিকান নাগরিকদের অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যে তখনকার মত যুদ্ধে আবশ্যকীয় রক্তের অভাবটা একরকম মিটল।

কিন্তু ডাঃ কন গবেষণার নূতন পর্যায়ে এসে পড়লেন। এবার গো-রক্ত পরীক্ষা পদ্ধতি মানুষের রক্ত পরীক্ষায় অবলম্বন করলেন। পরীক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় রক্ত রেডক্রশের ব্লাড-ব্যাঙ্ক থেকে যোগাড় করলেন। হার্ভার্ডে ডাঃ কন-এর ল্যাবরেটরি বাইরের লোকের চোখে যেন এক রহস্যের উৎস হয়ে দাঁড়াল, কারণ বদ্ধ দ্বারের

অন্তরালে থেকে তাঁরা কাজ করতেন। তাঁরা এমন একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন যার সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি বলে আশা করা যাচ্ছিল। আর যুদ্ধকালে এ সব ব্যাপার খুব হুঁসিয়ারির সঙ্গে সংগোপনে রাখা হয়।

এই ভাবে গবেষণা করতে করতে ডাঃ কন রক্তের পাঁচটি উপাদান আলাদা করলেন ও তার প্রত্যেকটির ওপর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন। দেখা গেল ঐ পাঁচটির মধ্যে চারটিতেই ভৈষজ-মূল্য প্রচুর বর্তমান। তাদের মধ্যে একটি উপাদান হল রক্তের প্রোটিন, যার নাম গামা গ্লোবুলিন।

দেখা গেল রক্তের এই প্রোটিনাংশেই রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা রয়েছে। যে কোন সংক্রামক ব্যাধি-আক্রান্ত রোগীর রক্তেই এই ক্ষমতা গড়ে উঠতে দেখা যায়।

সামরিক প্রয়োজনে রেডক্রশ প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের শত-সহস্র নরনারীর কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করেছিল। সব-রকম রক্ত এক সঙ্গে মিশিয়ে রাখার ফলে তার ভেতরে হাম, ডিপথিরিয়া, লাল-জ্বর, হুপিং কফ, মামস্ প্রভৃতি বহুপ্রকার রোগের অর্জিত প্রতিষেধ শক্তি নিহিত ছিল। প্রতি দশজনের মধ্যে প্রায় ন-জনেরই হয়ত ছেলেবেলায় হাম হয়েছিল, তার দরুণ রক্তে এই রোগের প্রতিষেধ-শক্তি বিশেষভাবে দেখা গিয়েছে। ডাঃ কন-এর পরীক্ষা থেকে দেখা গেল রক্তের প্রোটিনাংশ এই রোগ প্রতিরোধে সক্ষম সেনানী।

ডাঃ কন তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কারের বিবরণী ন্যাশানাল রিসার্চ কাউন্সিলে পেশ করবার পর খানিকটা গামা গ্লোবুলিন (প্রতিষেধ-প্রোটিন) তৈরি করে নানা বিভাগে হাম ও মামস্-এর প্রতিষেধক হিসেবে পাঠানো হল। অনতিবিলম্বে এর ব্যবহার হল ও উল্লেখযোগ্য ভাল ফল পাওয়া গেল।

তারপর চিকিৎসকদের সহযোগিতায় সেনা-শিবির ও বিদ্যালয় সমূহে হাজার হাজার লোকের ওপর ব্যবহার করা হল। অধিকাংশের ওপরই এর ক্ষমতা কার্যকরী হল; তবে নতুন আবিষ্কৃত বলে প্রয়োগ পদ্ধতি তখনো নিখুঁত ও সুষ্ঠু হয়ে ওঠেনি।

ক্রমে ব্যবহার করতে করতে তা ঠিক হয়ে গেল, কার্যকারিতাও বেড়ে গেল। তখন সামরিক প্রয়োজনে ওষুধ-উৎপাদক ব্যবসায়ীদের গামা গ্লোবুলিন ও অন্যান্য রক্তজাত রোগ-প্রতিষেধ ঔষধ তৈরি করতে ইজারা দেওয়া হল।

আজকাল গামা গ্লোবুলিন সামরিক বেসামরিক নির্বিশেষে সকল রোগীর চিকিৎসাতেই প্রয়োগ করা হয়। ইনজেকশন-সূচ দিয়ে মাংসপেশীতে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়। ডাক্তাররা আজকাল মাত্রা কমিয়ে বারবার এটা ব্যবহার করছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতায় এই পদ্ধতিই সুষ্ঠু বলে মনে হয়। এক সংগে বেশিমাত্রা ব্যবহারে রোগী সদ্য সদ্য ফল পায় সন্দেহ নেই কিন্তু রোগীর দেহে ভবিষ্যত-সংক্রমণ প্রতিরোধ-শক্তি গড়ে উঠবার ফুসরত পায় না।

কোন সুস্থ লোককে অল্পমাত্রায় ইনজেকশন দিয়ে দেওয়া হল। তাতে হয়ত তার খুব মৃদু ও সামান্য হামজ্বর হল। কিন্তু সা৷ ৭ সারতে হাম প্রতিষেধ শক্তি শরীরে জন্মে গেল, আর অল্প মাত্রায় ব্যবহারের জন্য খারাপ কোন প্রতিক্রিয়াও হলনা। আজকাল ডাক্তাররা এই চিকিৎসারই পক্ষপাতী।

হার্ভার্ডে ডাঃ কন-এর তত্ত্বাবধানে রক্তের উপাদানের বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা চলল। প্রথমে পাঁচটি উপাদান থেকে শুরু করে রক্তে আজকাল কুড়িটি উপাদান বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে এবং তাদের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। গামা গ্লোবুলিন নিয়ে নিত্য নতুন গবেষণা ও বিভিন্ন রোগীর ওপর নানাভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

হামের মত সংক্রামক কামলা রোগেও এর প্রতিরোধ ক্ষমতা সমান। হুপিং কাশি, মামস, লালজ্বর ও ডিপথিরিয়ার ওপর এর পরীক্ষা চলছে।

এই আবিষ্কারের ফলে কতকগুলি রাষ্ট্রে রক্ত সংগ্রহ বা রক্ত ক্রয়ের কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সংগৃহীত রক্ত থেকে গামা গ্লোবুলিন ও অন্যান্য উপাদান বের করে জনসাধারণের ব্যবহারে ব্যয়িত হয়।

অন্যান্য রাষ্ট্রে স্থানীয় রেডক্রশ প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ-বিভাগ এই কাজে সহায়তা করে। হাসপাতাল বা জন-স্বাস্থ্য সংস্থার প্রয়োজনে তাঁরা এখনো যুদ্ধের সময়ের মত রক্ত সংগ্রহে বের হন। অবশ্য একমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে এঁরা অগ্রসর হন, যেখানে রোগীদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা করা হয়। আমাদের রক্তের গামা গ্লোবুলিনে আরো কী কী রোগের প্রতিষেধক ক্ষমতা আছে তার বিস্তৃত খবর আরো কয়েক বছর পরে পাওয়া যাবে।

জীবাণু বাহকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

হিংস্র বাঘ সিংহকে প্রাণের ভয়ে সবাই এড়িয়ে চলে, কিন্তু কেউ যদি মশা, মাছি বা উকুনকে ডরায় ত লোকে তাকে বিদ্রূপ করে। আসলে এই সকল নগণ্য কীট পতঙ্গগুলিই অরণ্যচারী অতিকায় বন্য পশুদের চেয়ে বেশি মানুষ মারে। তারা অবশ্য শ্বাপদের মত দাঁত নখ দিয়ে মারে না, বিভিন্ন রোগ বীজাণু বয়ে নিয়ে গিয়ে মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত করে মৃত্যু ঘটায়।

এই সমস্ত কীট পতঙ্গ যন্ত্রণাদায়ক ও মারাত্মক রোগ বীজাণু বয়ে বেড়ায় বলে আমাদের উচিত যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মত এদের বিরুদ্ধেও চরম লড়াই চালানো।

গত যুদ্ধের সময় এই সব বীজাণু-বাহক পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে

লড়বার প্রতিষেধক খুঁজতে গিয়ে ডি ডি টি আবিষ্কার হল। এই ব্রহ্মাস্ত্র যুদ্ধোত্তর যুগেও আমাদের মারাত্মক শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করছে।

আমেরিকান সৈন্যদের প্রথমে যেখানে যেখানে পাঠানো হয়, তার কয়েকটি এলাকা ম্যালেরিয়া প্রধান। কাজেই সামরিক চিকিৎসা বিভাগের অন্যতম সমস্যা হল এ্যানোফিলিস মশা সংক্রামিত ম্যালেরিয়া। আমেরিকান সৈন্যেরা জাপানিদের বিরুদ্ধে যেসব প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং নাৎসিদের বিরুদ্ধে উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে লড়াই করছিল সেখানে এদের প্রাদুর্ভাব ছিল প্রচুর।

এই ভয়াবহ রোগের বিস্তার বন্ধ করতে কতকগুলি ইঞ্জিনিয়ার ও স্বাস্থ্যবিভাগীয় অফিসারকে সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো হল। তাঁরা বদ্ধ জলের পচা ডোবাগুলিতে সম্ভবক্ষেত্রে সেচ বা জলে বিষ ছড়িয়ে মশার প্রজনন বন্ধ করবেন। তাছাড়া সৈনিকদেরও এমন উপকরণ ও নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হল যাতে নিজেরাই মশার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। তারা খাটিয়ার ওপর টাঙাবার মশারি পেল। হাতে ও মুখে মাখবার জন্যে স্ক্রিনেল! পেল, যা মাখলে মশা কাছে বড় ঘেঁসে না। মশামারা বোমা দেওয়া হল—আত্মরক্ষার গোপন গর্তে অথবা ঝোপঝাড়ে যেখানে আশ্রয় নেবে আগে ছিটিয়ে নেবে। এইগুলি ঠিক ঠিক ব্যবহারের বিধি ও সতর্কতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে শিবির ও ব্যারাকগুলিতে প্রাচীরপত্র টাঙিয়ে দেওয়া হল। এ্যানোফিলিস মশার মারাত্মক প্রভাব বর্ণনা করে সৈন্যদের মধ্যে পুস্তিকাও বিতরণ করা হল। ফার্ডিনাণ্ড রচয়িতা মুনরো লীফ এই পুস্তিকাটি তৈরি করেন। তাতে এক জায়গায় লেখা আছে:

"একে চেন ? এ হল কুমারী এ্যান, এ যে তোমাকে পাবার জন্যে অধীর হয়ে আছে। এ্যানকে সত্যিই ঘুরে বেড়াতে দেখবে।' তার পুরো নাম কিন্তু এ্যানোফিলিস। তার কাজ হল ম্যালেরিয়া পরিবেশন করা। জগতে ম্যালেরিয়া পরিবেশনের সেই একমাত্র অধিকারিণী। তাকে যদি সাবাড় করতে পার ত নিস্তার পেলে জেনো। এ্যান রাত্রে অভিসারে বের হয়। আর পিপাসা পেলেই রক্ত খায়। মাথাটা নিচুকরে আক্রান্ত দেহে তুরপুনের মত তীক্ষ্ণ হুলটি ফুটিয়ে দিয়ে রক্ত শুষে খেতে থাকে। কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোককে কামড়ালে রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার বীজাণু এ্যানের দেহে উঠে আসে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে আবার তৃষ্ণার্ত হয়ে অসচেতন কোন হতভাগ্যকে হয়ত আক্রমণ করল। অসতর্ক লোক পেয়ে এ্যান আকণ্ঠ রক্তপান করতে থাকে। সেই সুযোগে তার দেহের ভেতরকার ম্যালেরিয়ার বীজাণু আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থদেহে সহজেই সংক্রমিত হয়। বেচারি তখন কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু আট থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যেই টের পাবে সে মারাত্মক ম্যালেরিয়ার কবলে পড়েছে।"

তারপরে এই পুস্তিকায় বলা হয়েছে সকলে যেন অতি অবশ্য মশারি খাটিয়ে ঘুমায়। আর কেউ যেন মশারির ধার ঘেঁসে না শোয়; কেননা মশারির দেয়াল ভেদ করে মশা হুল ফুটাবার ক্ষমতা রাখে। খবরদার! মশারির কোথাও কোন ছেঁড়া-ফুটো কিছু না থাকে। আর সবাই যেন সরবরাহ-করা মশা মাছি বিতাড়ন লোশন বা স্প্রে অনবরত ব্যবহার করে।

প্রথম প্রথম যে কীট-নাশক স্প্রে বা সিঞ্চনের ওষুধটি ব্যবহার করা হত সেটা মন্দ ছিল না। ব্যবহারের পর জায়গাটি ঘণ্টা চারেক অন্তত মশামাঁছি মুক্ত থাকত। তারপর আবার ব্যবহার করতে

হত। কিন্তু প্রায়ই সৈন্যরা এত ক্লান্ত বা শত্রুর আক্রমণে এমন ব্যতিব্যস্ত থাকত অথবা ভীষণ কোন বিপদ বা সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে কাটাত, বার বার এই স্প্রে ছিটানোর হাঙ্গামা পোয়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব হত না।

সৈন্যদের মশা-মারা যে বোমা দেওয়া হত, তাতে পাইরিথ্রাম বলে একরকমের পদার্থ থাকত। এই পাইরিথ্রাম সংগ্রহ করা হত ডেজি ফুলের মত একরকম ফুল থেকে। এই জাতীয় কয়েকটি ফুল আমাদের বাগানে দেখা যায়। কিন্তু এই পাইরিথ্রাম নামক কীট পতঙ্গনাশী ওষুধের বিশেষ শ্রেণীর গাছটি পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া উপনিবেশে জন্মায়। একবার অজন্মা হওয়ায় সামরিক চিকিৎসা বিভাগের বড় কর্তারা আবার কঠিন সমস্যায় পড়লেন। এখন মশা-মারা বোমার উপাদান কোথায় পাবেন!

জেনারেল জেমস সাইমনস ছিলেন প্রতিষেধক ওষুধ বিভাগের কর্তা। এই মশক-নাশা ওষুধ যোগাড়ের দায়িত্ব তাঁরই। তিনি দেখলেন ওষুধের জন্যে মাত্র এক শ্রেণীর ফুলের ওপর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত নয়। তার ওপর ফুলটা দুর্লভ, বিশেষ করে সারা পৃথিবীতে অতি অল্প জায়গাতেই জন্মায়। পাইরিথ্রামের বীজ আমেরিকা নিয়ে গিয়ে চাষ করে দেখলেন ওখানকার মাটিতে ওগাছ ভাল জন্মায় না। অবশেষে সাব্যস্ত করলেন নতুন কোন রাসায়নিক পদার্থ বের করতে হবে যাকে পাইরিথ্রামের পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে—চাই কি এর থেকে ভাল কাজ দেয়!

দৈবযোগে এমন একটা রাসায়নিক পদার্থ তখনো ছিল। তবে কেউ বড় একটা জানত না। আমরা যাকে ডিডিটি বলি সেই পদার্থটাই ছিল। অবশ্য ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় ছিল, তা নয়। সত্তর বৎসর আগে স্ট্রাসবুর্গের জনৈক বৈজ্ঞানিক [illegible] প্রথম আবিষ্কার

করেন। এবং একটা গালভরা বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন। অবশ্য তিনি এই পদার্থটি কীট-নাশক হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব ভাবেননি, তারপরে এত বছরের মধ্যেও অন্য কারো মাথায় সে চিন্তা আসেনি।

১৯৪০ সাল নাগাদ একটি সুইস কোম্পানি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল এর ভেতর কীটাণু-নাশক গুণ রয়েছে। যে সব পোকামাকড় বাগানের গাছপালা বা মাঠের শস্য খেয়ে নষ্ট করে, গৃহপালিত পশুদের জ্বালাতন করে তাদের এ দিয়ে মারা যায়। এই কোম্পানি দুটি দ্রব-ওষুধ তৈরি করল। একটি গাছপালা-খেকো পোকাদের মারবার জন্যে আর একটি মাছি ও উকুন জাতীয় পোকা মারবার জন্যে। তারপর তারা খদ্দের জোটাবার জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে লাগল।

এমনি সময়ে জেনারেল সাইমনস মশক নিবারণের জন্যে রাসায়নিক দ্রব্য খুঁজছিলেন। সুইস কোম্পানি তাঁর অফিসে ওষুধের একটি নমুনা পাঠিয়ে দিল, এবং সঙ্গে ব্যবহারের নিয়মাবলী ও কিভাবে এ পর্যন্ত প্রয়োগ করে ফল পাওয়া গিয়েছে তার বিবরণও দিয়ে দিল। জেনারেল সাইমনস কৃষিবিভাগের বৈজ্ঞানিকদের কাছে এই নমুনাটি পাঠিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করতে বললেন। দেখা গেল এতে ডিডিটি নামক রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে এবং মশা মাছি বেশ মারতে পারছে। ফ্লোরিডার অন্তঃপাতী অরল্যাণ্ডোর কৃষি ও বন সংরক্ষণ বিভাগ এর পরীক্ষা করল।

ফল খুব যে আশাপ্রদ হল তা বলা যায় না। তারপর এর উন্নতির জন্যে ওখানেই গবেষণা শুরু হল। তাঁরা অনেক পরীক্ষা করে দেখলেন, ডিডিটির সঙ্গে সুইস কোম্পানির ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ ছাড়াও ভিন্ন ধরনের কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ মেশানোর ফলে ডিডিটির কার্যকারিতার আশ্চর্য উন্নতি হল। দেখা গেল এই

নতুন মিশ্রিত মাত্র দুই পাউণ্ড ড়িডিটি একশ গ্যালন জলে মিশিয়ে যে পদার্থ হল তা দিয়ে একটি গোলাবাড়ির সমস্ত মশামাছি নিঃশেষে মেরে ফেলা যায়। শুধু তাই নয়, কয়েক মাসের মত গোলাবাড়ি মশামাছি পোকামাকড় মুক্ত থাকে। আরো একটু সংস্কার ও উন্নত করে একে এমন মৃদু অবস্থায় আনা হল যাতে মানুষের কোন ক্ষতি না হয়।

এই সিঞ্চন দ্রবটি সত্যিই একটি অপূর্ব আবিষ্কার। এমন কি জেনারেল সাইমনস যা আশা করেছিলেন তার চেয়েও অনেক বেশি ফলপ্রসূ।

এইবার ওষুধ ...তকারদের এই আবিষ্কারের কথা জানিয়ে সামরিক প্রয়োজনে ডিডিটি তৈরি করতে বলা হল। কিছুদিনের মধ্যেই নতুন ডিডিটি লক্ষ লক্ষ মশামাছি মেরে অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাময় পরিবেশ 'পরিষ্কার করে ইউরোপ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সবাইকে রোগের আতঙ্ক থেকে নিশ্চিন্ত করল। ১৯৪৩ সালে সামরিক প্রযোজনে মাসে ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড ডিডিটি বরাদ্দ হল। শুধু ছিটাবার জন্যেই ব্যবহার হত না, তেলের সঙ্গে মিশিয়ে পুকুরে ডোবায় ঢেলে মশার ডিম ও শূক-কীট ধ্বংস করা হত। তাছাড়া টাইফাস বীজাণু-বাহক উকুনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সৈন্যরা পোশাকে ডিডিটির শুকনো গুঁড়ো মাখিয়ে নিত।

ইটালির নেপলস শহরে যখন আমেরিকান সৈন্যদল প্রথম প্রবেশ করে ডিডিটি তখন বেশ ভাল কাজ দিয়েছিল! শহরটি চুনাপাথরের পাহাড়ের ওপর অবস্থিত আর পাহাড়ের গায় সুইস পনীরে যতগুলি ছিদ্র আছে বোধ হয় ততগুলি গুহা আছে। এর কোন কোন গুহা ত্রিশ থেকে সত্তর ফুট উঁচু আর শহরের বড় বড় রাস্তার চেয়েও প্রশস্ত। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন এখানে লড়াই চলছিল,

হাজার হাজার লোক এই সব গুহাগুলিকে বিমান আক্রমণের সময় আশ্রয়-ঘাঁটি রূপে ব্যবহার করত। যাদের বাড়ি-ঘর দুয়ার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল তারা বোর্ড, চট ইত্যাদি দিয়ে বড় বড় গুহাগুলি কোন রকমে ঢেকে আস্তানা তৈরি করেছিল। এমন কি শহর পুনরধিকৃত হওয়ার পর শান্তি ফিরে এনেও গুহাগুলি রীতিমত এক শ্রেণীর লোকের আবাসস্থল হয়ে উঠেছিল! যদিও এর পরিবেশ রীতিমত অস্বাস্থ্যকর এবং আধুনিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থার কোন বালাই ছিল না। টাইফাস রোগের ডিপো বলকান রাষ্ট্রগুলি হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীরাই হয়ত সঙ্গে করে এখানে প্রথম টাইফাস রোগের বীজাণু আমদানি করে। আর ঐ সব গুহার নোংরা আবর্জনায় বাস করে উকুন বেড়ে গেল এবং তাদের মারফত টাইফাসের জীবাণু অন্যের শরীরে সংক্রামিত হল। ফলে রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল! এই সময় আমেরিকান সৈন্যেরা এসে পৌঁছল এবং সঙ্গে সঙ্গে সামরিক রোগ-প্রতিরোধ বিভাগ পূর্ণ উদ্যমে কাজে লেগে গেল।

ভাল করে ডিডিটি ছড়িয়ে দেওয়া হল। গুহাগুলির ভেতরকার টাইফাস আক্রান্ত লোকদের স্বতন্ত্র করে সরিয়ে রাখা হল। শহরেও সমস্ত নর-নারী ও শিশুদের রোগ সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে বীজাণু বাহক উকুন ধ্বংস কেন্দ্রে সমবেত হয়ে শরীর উকুন-মুক্ত করতে বলা হল। ফলে ধনী, দরিদ্র, দুর্বল, সবল নির্বিশেষে সবাই এই মারাত্মক ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে কেন্দ্রে এসে সমবেত হল। তাদের কাপড়-জামা সব ডিডিটি পাউডার মাখিয়ে কীট-প্রতিষেধক করে দেওয়া হল।

এইভাবে টাইফাস রোগটি মাথা চাড়া দিতে না দিতেই দমিয়ে

দেওয়া হল। আক্রান্ত রোগীদের কেউ কেউ মারা গেল কেউ বা আরোগ্য লাভ করল। কিন্তু রোগটি সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল। আগেকার দিনে একবার কোন শহরে টাইফাসের প্রাদুর্ভাব হলে, অর্ধেক কি তারও বেশি লোক মরে উজাড় হয়ে যেত! আজকাল-কার দিনে এই রোগবাহী উকুনের মৃত্যুবাণ আমাদের হাতে।

যুদ্ধোত্তর যুগেও ডিডিটি আমাদের বহু উপকারে লাগছে। সব রোগের বীজাণু-বাহকদের ধ্বংস করবার অমোঘশক্তি না থাকলেও সৌভাগ্যক্রমে অনেকগুলি মারাত্মক বীজাণুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে।

খাদ্যপ্রাণের সন্ধান

লুকানো শক্তি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রণক্লান্ত ক্ষুধার্ত ইউরোপীয়দের জন্যে বহু জাহাজ খাদ্যে বয়ে এনেছে। প্রতি পাউণ্ড বিশুদ্ধ খাদ্যপ্রাণ এক জাহাজ খাদ্য যত লোকের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম, তত লোক বাঁচাতে পারে।

খাদ্যপ্রাণ অতি রহস্যজনক ও আশ্চর্য জিনিস। এগুলি আমাদের অতি সাধারণ খাদ্যেই নিহিত অতি সূক্ষ্ম রাসায়নিক পদার্থ। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে বিভিন্ন রকম খাদ্যপ্রাণ একত্রে এক আউন্সের তিনশ ভাগের এক ভাগ থাকা দরকার। পরিমাণে এত অল্প হলেও এইটুকু আমাদের পক্ষে অপরিহার্য বলা যায়।

আমাদের শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যপ্রাণটুকু চাইই। কতকগুলি খাদ্যপ্রাণ এত প্রয়োজনীয় যে তাদের অভাবে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব। কতকগুলি আমাদের স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ ও সবল রাখে। কতকগুলির প্রভাব আমাদের চক্ষুতে, কতকগুলি শিশুদের পুষ্টিকারক আবার কতকগুলি পূর্ণবয়স্কদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বজায় রাখে। কতকগুলি আমাদের হাড় শক্ত করে, কতকগুলি পেশী, শোণিত-সংবহণ-তন্ত্র প্রভৃতি ওপর আধিপত্য করে।

আমরা যে সব শাকসবজি, ফলমূল, দুধ, গম, চাল, ডাল ও মাংস খাই, তার মধ্যে খাদ্যপ্রাণ প্রচুর পরিমাণে থাকলেও সবটুকু আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

কলের মাধ্যমে শস্য থেকে চাউল, আটা, ময়দা প্রভৃতি প্রস্তুত করতে গিয়ে কিছু কিছু নষ্ট হয়ে যায়। ফল ও তরকারির খাদ্যপ্রাণ টিনে প্যাক করার সময় নষ্ট হয়। তাজা শাকসবজি রেলগাড়িতে আসতে আসতে বা গুদামে ও দোকানে পড়ে থেকে খাবার টেবিলে পৌঁছতে কিছুটা খুইয়ে আসে। তারপর রান্না করবার সময়ও কিছুটা খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়।

এই জন্যে অনেক লোক বেশ ভাল খাদ্য খাচ্ছে দেখা গেলেও প্রয়োজনানুপাতে খাদ্যপ্রাণ পায় না। তাছাড়া কতকগুলি বিশেষ অসুখে শরীর সাধারণ খাদ্য থেকে খাদ্যপ্রাণ গ্রহণ করতে পারে না। এদের সবাইকে সুস্থ রাখতে হলে স্বাভাবিক খাদ্য ছাড়াও অন্য উপায়ে দেহে খাদ্যপ্রাণ সরবরাহ করা দরকার। আর পয়সার অভাবে দু-বেলা দুমুঠো খাবার জোটাতে পারে না এমন লোক পৃথিবীতে বহু আছে, তাদের জন্যে তো কথাই নাই!

গত কয়েক শতাব্দী যাবত বহু লোক খাদ্যপ্রাণের অভাবজনিত রোগে ভুগছিল। কেউবা স্বাস্থ্য হারিয়ে কষ্ট পেয়েছে, কারো অকাল মৃত্যু ঘটেছে। আসল কারণ অবশ্য তখন জানা যায় নি।

সেকালে সমুদ্র যাত্রায় স্কার্ভি বলে এক মারাত্মক রোগের উৎপাত ছিল। অতি ধীরগামী বাণিজ্য জাহাজ বা আরো বেশিদিন ব্যাপী নতুন দেশ আবিষ্কারকারী একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় অনেক লোক স্কার্ভি রোগে ভুগত। আবার কখনো কখনো এই রোগে এত বেশি লোক মারা পড়ত যে, জাহাজ দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্যে নাবিকের অভাব হত।

কিন্তু দৈবাৎ আবিষ্কৃত হল জাহাজে যদি লেবু বা ঐ জাতীয় ফল লবণে-জরানো মাংস ও শুকনো বিস্কুটের সঙ্গে পুষ্টিকর পরিপূরক হিসেবে সরবরাহ করা হয়, তাতে স্কার্ভির উৎপাত কমে; কখনো বা

আদৌ হয় না। জাহাজের ক্যাপ্টেন বা তাদের ওপরওয়ালা সরকারি কর্তারা কোনদিন বুঝতে পারেননি—ঐসব লেবুজাতীয় খাদ্যে এমন কী পদার্থ আছে যাতে নাবিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা পায়! অবশ্য এই অভিজ্ঞতার ফলেই পরবর্তীকালে জাহাজ দূরে পাঠাবার সময় লেবুর রসদ বোঝাই দিয়ে পাঠানো হত। আসলে ভিটামিন সি-র অভাবেই স্কার্ভি রোগ হত এটি তখন কেউ জানত না। অন্যান্য খাদ্যপ্রাণ রহস্যের মত এই ভিটামিন সি-র তথ্য তখন এবং তারপরেও বহুদিন অজ্ঞাত ছিল।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন ও স্বাস্থ্যরক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করেন একজন তরুণ ওলন্দাজ ডাক্তার, তাঁর নাম খ্রিশ্চিয়ান ইজিকম্যান। ১৯০০ সালের কিছু আগে সরকারি চিকিৎসা বিভাগে কাজ করতে ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তাঁকে পাঠানো হয়। সে সময় বেরিবেরি রোগে দিনের পর দিন বহু ওলন্দাজ সৈন্য কাবু হয়ে পড়ছিল। ওলন্দাজ সরকার রোগের কারণ ও সারাবার উপায় খুঁজে বের করতে ডাক্তারদের নির্দেশ দিলেন।

একদিন এই তরুণ ডাক্তার ইজিকম্যান একটা জিনিস লক্ষ করলেন—অনেকেই হয়ত তাঁর আগেও দেখেছে, কিন্তু কেউই সে ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেয় নি। ডাক্তারের সজাগ মন তা থেকে একটি তথ্য খাড়া করলেন।

একবার কতকগুলি মুরগি অসুস্থ হয়। ডাঃ ইজিকম্যান দেখলেন রোগটা যেন অনেকটা মানুষের বেরিবেরি রোগের মত। তিনি লক্ষ করলেন—নির্দিষ্ট খাদ্যের অভাব ঘটায় মুরগিগুলিকে কলে ছাঁটা সাদা মসৃণ চাল দেওয়া হচ্ছে। এই খাদ্য নিয়ে তিনি পরীক্ষা শুরু করলেন। মসৃণ চালের পরিবর্তে আকাঁড়া লাল

চাল খেতে দিলেন। দেখা গেল লাল চাল খেয়ে মুরগিগুলির অসুখ সেরে গেছে। এই থেকে ডাক্তার সাব্যস্ত করলেন এদের সুস্থ রাখার জন্যে চালের গায়ে লাল খোসাগুলি অপরিহার্য।

ডাঃ ইজ্‌কম্যান ভেবে দেখলেন সাধারণ সৈন্যদের নির্দিষ্ট আহার্যের ভেতর কলে ছাঁটা সাদা চালের ভাতই বেশি আর সেইজন্যেই এদের এত বেরিবেরি রোগ হচ্ছে, কিন্তু তখনকার দিনের চিকিৎসকদের ধারণা অন্য রকম অথবা কারো কোন ধারণাই ছিল না। কাজেই তাঁদের ব্যাপারটা বোঝাতে এবং বিশ্বাস করাতে বেশ সময় লাগল। এমনকি মুরগি ও লাল চাল নিয়ে বৃথা সময় ও সরকারের অর্থ অপব্যয় করছেন বলে অনেকে বিরুদ্ধ আলোচনা করতেও ছাড়লেন না। কিন্তু তাঁর নিজের দৃঢ় বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্যের কাছাকাছি এসেছেন, তাই নিজের গবেষণা নিয়ে অটলভাবে লেগে রইলেন।

অবশেষে চিকিৎসা বিভাগের একজন ওপরওয়ালার দৃষ্টি এবিষয়ে আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন। তখন দুজনে মিলে সে অঞ্চলের বিভিন্ন জেলখানায় গিয়ে সেখানকার খোরাক ও স্বাস্থ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। বেশ কয়েক মাসের চেষ্টায় দেখলেন, কলের চাল খেয়ে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কয়েদিদের মধ্যে চারশ জন বেরিবেরি আক্রান্ত, আর ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশ কয়েদি যাদের আকাঁড়া লাল চালের ভাত সরবরাহ করা হয়েছিল তাদের মাত্র নয়জন ঐ রোগে ভুগেছে।

তারপর ডাঃ ইজ্‌কম্যান ঐ লাল চালের খোসার ফেন তৈরি করে বেরিবেরি রোগাক্রান্ত লোকদের খাওয়াতে লাগলেন। অচিরেই প্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল। সত্যিই লোকগুলি সেরে উঠল।

এইবার ডাঃ ইজিকম্যানের সুদৃঢ় বিশ্বাস হল যে, চালের খোসার গায়ে এমন একটি অজ্ঞাত রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যা স্বাস্থ্যরক্ষা এবং জীবনধারণের জন্যে অপরিহার্য। কিন্তু তখনকার দিনে তিনি ঐ পদার্থকে পৃথক করে এবং পরীক্ষা করে আলাদা নামকরণ করতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি অন্যতম খাদ্যপ্রাণগুলির একটির আবিষ্কারক। যদিও তখনো তার কোন নামকরণ হয়নি। তাঁর বিবরণ অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে অন্যসব খাদ্যপ্রাণ আস্তে আস্তে আবিষ্কৃত হয়েছে। রহস্যাবৃত খাদ্যপ্রাণগুলি অদ্ভুত শক্তিদায়ক ও পুষ্টিকর পদার্থ এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

খাদ্যপ্রাণ সন্ধানে অগ্রগতি

ডাঃ ইজিকম্যানের আবিষ্কারে উৎসাহিত অনেক তীক্ষ্ণধী চিকিৎসক খাদ্যের উন্নতি-সাধন চিন্তায় মনোনিবেশ করলেন! তাঁরা গবেষণা করে মানুষের খাদ্যকে সুষম করে তোলবার চেষ্টায় খাদ্যে কতকগুলি অত্যাবশ্যক জিনিসের নির্দেশ দিলেন—মাংস, শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ, দুধ, শাকসবজি, ফল প্রভৃতি। যাতে দেহের প্রয়োজনমত সবই পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও দেখা গেল অনেক সময় খাদ্যপ্রাণের অভাব-জনিত দু-একটি রোগে কেউ কেউ ভুগছে। তা ছাড়া পয়সার অভাবে ভাল খাবার যাদের জোটে না বা নানা অজ্ঞাত উপসর্গের দরুন যারা খাদ্যপ্রাণের অভাবে ভুগছে তাদের সমস্যাও ত কম নয়!

ডাঃ ক্যাসিমির ফাঙ্ক নামে একজন পোলিশ বৈজ্ঞানিক এই অজ্ঞাত খাদ্যপ্রাণের সন্ধানে এগিয়ে এলেন। ১৯১১ সালে লণ্ডনের লিস্টার ইনস্টিটিউটে তিনি একটি রাসায়নিক দ্রব্য বিশ্লেষণ করে পরীক্ষান্তে দেখলেন সেগুলি অল্পমাত্রায় পেলাগ্রা ও স্কার্ভি রোগাক্রান্ত

পশুদের ওপর প্রয়োগ করলে বেশ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই রাসায়নিক দ্রব্য আলাদা করা এত কঠিন, আর তার থেকে এত অল্প পরিমাণ ওষুধ-বস্তু পাওয়া যায় যে, এই নিয়ে কাজ করতে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ডাঃ ফাঙ্ক তাঁর আবিষ্কৃত রাসায়নিক দ্রব্যের নাম দিলেন ভিটামিন। কারণ ল্যাটিন ভিটা শব্দের অর্থ প্রাণ। তাঁর ধারণা এই পদার্থে প্রকৃতই প্রাণপ্রদ শক্তি আছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত জনসাধারণ এই ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ সম্পর্কে অবহিত ছিল না। তবে দু-চারজন বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা করে দেখছিলেন। ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিকে খাদ্যপ্রাণের তথ্য নির্ণয় কিছুটা অগ্রসর হয় বলা যায়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ এলমার ম্যাককোলাম খাদ্যপ্রাণের রহস্য উদ্‌ঘাটন শুরু করলেন। খাদ্যের স্নেহজাতীয় পদার্থ নিয়ে গবেষণা শুরু করে তিনি দেখলেন মাখন ও ডিমের কুসুমে নিহিত স্নেহজাতীয় পদার্থে একপ্রকার খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। যার নাম দেওয়া হল ভিটামিন এ।

আবার ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা ঢাই, কড প্রভৃতির মাছের যকৃত থেকে যে তেল তৈরি হয় তাতে যথেষ্ট পরিমাণ ভিন্ন প্রক . খাদ্যপ্রাণ আবিষ্কার করলেন। তাঁরা তার নাম দিলেন ভিটামিন ডি।

কিন্তু খাদ্যপ্রাণের প্রকৃত অনুসন্ধানের তখন সবে শুরু। ল্যাবরেটরিজাত উৎকৃষ্ট খাদ্যপ্রাণ উপযুক্ত মূল্যে পাওয়ার যোগ্য করে উৎপাদন করার উপায় তখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

১৯২০ সালের পর দুই দল বৈজ্ঞানিক একই বিষয়ে গবেষণা করে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হ'লেন। একদিকে নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ আলফ্রেড হেস ও তাঁর

সহকারীরা এবং অন্যদিক উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ হ্যারি স্টিনবোক ডাঃ আর্চি ব্লেকও তাঁর সহযোগীদের নিয়ে একযোগে কাজ করছিলেন। একই সময়ে দুই দলই আবিষ্কার করলেন সূর্যরশ্মির অতি বেগুনি রঙটি খাদ্যপ্রাণে রূপান্তরিত হয়ে কতকগুলি খাদ্যে সঞ্চিত হয়। আবার সেই খাদ্যপ্রাণই মাছের তেলে নিহিত ভিটামিন ডি থেকে অভিন্ন। তার মানে কোন কোন খাদ্যদ্রব্যে অতি বেগুনি রশ্মি কেন্দ্রীভূত করে প্রয়োগ করলে তার ভেতর ভিটামিন জমতে পারে। ডাঃ স্টিনবোক চর্বি ও অলিভ-তেলে আর ডাঃ হেস কার্পাস-বীজ ও তিসির তেলে অতি বেগুনি রশ্মি আরোপ করলেন।

বৈজ্ঞানিকদের উভয় দলই বুঝেছিলেন এটি অত্যদ্ভুত আবিষ্কার। এতে ডাক্তারদের হাতে খাদ্যপ্রাণের অভাব-জনিত ব্যাধির আরোগ্যের উপায় পৌঁছে দেওয়া হবে। এই ব্যাধিগুলির মধ্যে সব চেয়ে মারাত্মক হল রিকেট যা হাড় শক্ত হতে দেয় না—ফলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের পা ধনুকের মত বেঁকে যায় অথবা পঙ্গু করে দেয়।

ডাঃ স্টিনবোক এবং ডাঃ হেস উভয়েই তাঁদের আবিষ্কারের বিবরণ প্রকাশ করলেন। কিন্তু স্টিনবোকের বিবরণ জরুরি ডাকযোগে একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় পাঠানো হল। তার দু-মাস পরে ডাঃ হেস তাঁর আবিষ্কারের বিবরণ পাঠ করলেন আমেরিকান পেডিয়েট্রিক সোসাইটির এক বক্তৃতায়। ফলে এই আবিষ্কারের স্বত্ব পেটেণ্ট করে নেওয়ার অধিকার ডাঃ স্টিনবোকই পেলেন।

এরপর থেকেই খাদ্যপ্রাণের অনুসন্ধান বেশ জোরালোভাবে শুরু হল। ইজিকম্যান লালচালের খোসায় যে পদার্থটিকে খাদ্য-প্রাণ স্বরূপ বলে নির্ধারণ করেছিলেন তাকে বিশ্লেষণ করে

রাসায়নিক ওষুধে রূপান্তরিত করা ১৯২৯ সালের আগে বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা হয়ে উঠেনি। তার আগেই এটিকে ভিটামিন বি বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

পরে জানা গেল ভিটামিন বি-র সমপর্যায়ভুক্ত নিকট সম্পর্কিত অনেকগুলি খাদ্যপ্রাণ রয়েছে তাদের বলা হয় বি-কমপ্লেক্স। এই মিশ্র-শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণগুলির মাত্র একটিকেই সংশ্লেষ-পদ্ধতিতে তৈরি করতে আরো দশ বছরে কেটে গেল। এমনি ল্যাবরেটরিজাত প্রথমটির নাম হল বি-১ বা থিয়ামিন। এই থিয়ামিন তৈরি পদ্ধতি অবলম্বন করেই রিবোফ্লাবিন ও নিকোটিনিক অ্যাসিড নামক অন্য দুটি অচিরেই স্বতন্ত্র করা সম্ভব হল।

কিন্তু তখনো ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স-এর বহু অনাবিষ্কৃত রহস্য অজ্ঞাত হয়ে গেল। অবশেষে বস্টনের ডাঃ জর্জ মিনোটের গবেষণার খেই ধরে কিছুটা সন্ধান মিলল। এই চিকিৎসক আবিষ্কার করলেন কতকগুলি এ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতা রোগে মাছের তেল ও পশুর মেটে ব্যবহারে রোগীদেহে অনেক উপকার হয়। তিনি রোগীদের যথেষ্ট পরিমাণে যকৃত খাইয়ে অন্য ডাক্তারদের তুলনায় অনেক বেশি রোগীর রোগমুক্ত করতে সমর্থ হলেন।

মানুষের অস্থি-মজ্জার ভেতর যে বড় বড় কোষ আছে—যা থেকে লোহিত রক্ত-কণিকা-কোষ তৈরি হয়, রক্তশূন্যতার ফলে সেগুলি স্বাভাবিক সক্রিয়তা হারায়। ডাঃ মিনোট দেখলেন যকৃতে এমন একটি পদার্থ আছে যার ব্যবহারে অস্থি-মজ্জার অবস্থার উন্নতি হয় এবং আবার আগের মত সক্রিয় হয়ে ওঠে। তবে এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে চরম বলা যায় না। কেননা এতে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে যকৃত খেতে হয়।

অন্যান্য ডাক্তার বৈজ্ঞানিকেরা ডাঃ মিনোটের কার্যকলাপ

সাগ্রহে লক্ষ করছিলেন। তাঁরা যকৃতের ভেতরকার প্রয়োজনীয় অংশটুকুর অনুসন্ধানে লেগে গেলেন। গোটা যকৃত না খাইয়ে যকৃতে নিহিত বিশেষ পুষ্টিকর পদার্থটুকু স্বতন্ত্র করে রোগীদের খেতে দিলেই ত হয়! সুদীর্ঘ কুড়ি বছর এই নিয়ে গবেষণা চলল। কিন্তু এই গূঢ় রহস্যের অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীদের অনেক নাজেহাল হতে হয়েছে।

যাহোক, অবশেষে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পুষ্টিকর খাদ্য-প্রাণপূর্ণ যকৃত-নির্যাস তৈরি করা হল। এবং স্বতন্ত্রভাবে একটি উল্লেখযোগ্য খাদ্যপ্রাণ ব্যবহার করা সম্ভব হল।

১৯৪০ সালে বৈজ্ঞানিকরা টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পিনাক পাতা থেকে এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ বের করতে সমর্থ হলেন যা যকৃত নিহিত আশ্চর্যজনক পুষ্টিকর পদার্থেরই অনুরূপ। তাঁরা প্রথমত পশুর দেহে প্রয়োগ করে এর মূল্য অবহিত হলেন। পীড়িতের পক্ষে যকৃত ব্যবহারে উপকারিতার রহস্য বোঝার পক্ষে এই আবিষ্কার বেশ সহায়তা করল। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রজার্স উইলিয়ম এই আবিস্কৃত খাদ্যপ্রাণের নাম দিলেন ফলিক অ্যাসিড, কারণ পাতা (ফলিয়েজ) থেকে পদার্থটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে। ক্রমে জানা গেল এই জিনিসই ঈস্ট, শিম, ছাতা এবং প্রাণীদেহের যকৃত ও বৃক্কে রয়েছে।

এরপর বৈজ্ঞানিকরা ফলিক অ্যাসিড বিশ্লেষণ করে চেষ্টা করলেন যাতে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা যায় এবং প্রয়োগের সুবিধার জন্যে বড়ির আকার দেওয়া যায় কিন্তু দেখা গেল বড় কঠিন কাজ। যদি বা অনেক চেষ্টায় তৈরি করা সম্ভব হল, ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল রোগীর কোন উপকারে লাগছে না।

এইবার লিডারলি ল্যাবরেটরিজ নামক এক বিরাট ওষুধ

উৎপাদক প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে আগ্রহশীল হয়ে উঠল। এই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সের রহস্য উদ্ঘাটনে কৃত-সঙ্কল্প হলেন। তাঁদের স্থির বিশ্বাস—ধৈর্য ও অধ্যবসায় নিয়ে লেগে থাকলে বের করা সম্ভব হবে!

কোম্পানি থেকে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ষোলজন বৈজ্ঞানিক ফল-রিভার ল্যাবরেটরিতে নিযুক্ত হলেন এবং এঁদের গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েক হাজার ডলার মঞ্জুর করা হল।

এই বৈজ্ঞানিকরা বিশুদ্ধ ফলিক অ্যাসিড বের করতে তৎপর হলেন যা থেকে সহজেই ব্যবহারোপযোগী জিনিস তৈরি করা সম্ভব হবে। যত রকমের পদার্থে এই রাসায়নিক থাকা সম্ভব বলে মনে হল, তাদের প্রত্যেকটি পরীক্ষা করে ত দেখলেনই, তাছাড়াও হাতের কাছে যা পেলেন নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন। অবশেষে বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটির সন্ধান মিলল এক অতি অদ্ভুত জায়গায়, প্রজাপতির পাখায় হলদে রঙের মধ্যে!

পাখালব্ধ ফলিক অ্যাসিড বিশ্লেষণ এবং কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে তৈরি করতেও সমর্থ হলেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল নবাবিষ্কৃত বস্তুটি রক্তশূন্যতা রোগে আশানুরূপ কার্যকরী হয়েছে। এইবার রোগীর ওপর প্রয়োগ করে দেখা দরকার।

ডাঃ টম স্পাইস-ই সর্বপ্রথম হাসপাতালে রোগীদের ওপর ব্যবহার করে দেখলেন। তিনমাস পরে তাঁর বিবৃতিতে জানা গেল চমৎকার ফল পাওয়া যাচ্ছে। আরো দেখা গেল গোটা যকৃত খাওয়ার চেয়ে মজ্জার পুষ্টিসাধনে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সের অংশ ফলিক অ্যাসিড ব্যবহারে অনেক বেশি ফল পাওয়া যায়।

অনুসন্ধানপর্ব শেষ হল। কোম্পানি বৈজ্ঞানিকদের কৃতিত্বের ওপর যেন বিরাট বাজি ধরে বসেছিল! অবশ্য ব্যবহারোপযোগী

ফলিক অ্যাডিস আবিষ্কারে সবাই উপকৃত হয়েছে। পুষ্টি অভাবগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্যে কোম্পানি প্রচুর পরিমাণে এই যৌগিক পদার্থটি উৎপাদন করতে শুরু করল। এবং যাতে সহজে দোকানে পাওয়া যায় সেজন্যে বড়ির আকারে তৈরি হতে থাকল। অবশেষে এর বিক্রি থেকেই গবেষণার জন্যে ব্যয়িত সমস্ত টাকাই উঠে আসতে লাগল।

কৃত্রিম উপায়ে ব্যবহারোপযোগী ফলিক অ্যাসিড তৈরি হবার আগেই অন্য কয়েক প্রকার ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হচ্ছিল। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ ভাগে অনেকগুলি ওষুধ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ভিটামিন বড়ি তৈরি করে বাজারে ছেড়েছিল। লক্ষ লক্ষ লোক তাই স্বাস্থ্যের উন্নতিকারক বলে ব্যবহার করছিল। অনেকের হয়ত উপকার হত। কারো কারো কোন কাজেই আসত না। আবার কারো হয়ত বিশেষ কোন ভিটামিনের দরকার কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন মনে না করে বাজারে সুলভ বস্তুটিই কিনে ব্যবহার করত।

অবশ্য হাসপাতাল বা হাসপাতালের বাইরে চিকিৎসকদের দ্বারা রোগীদের ওপর ভিটামিনের প্রয়োগের মূল্য অনেক বেশি। বছরের পর বছর তাঁরা বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন ভিটামিন ব্যবহার করে, ফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছেন। এই সব বিবরণ সংগ্রহ করে ভিটামিন প্রয়োগ আরো উন্নত, অব্যর্থ হয়েছে এবং প্রয়োগ-ক্ষেত্র প্রসার পেয়েছে।

১৯৪৪ সালে মধ্যেই ভিটামিনের জনপ্রিয়তা এত বেড়ে গেল যে, এক বছরেই বিশ কোটি ডলার মূল্যের ভিটামিন বিক্রি হয়েছে! অবশ্য তার কারণও অনেক ছিল। ডাক্তারদের বিধান ও জন-সাধারণের চাহিদা বৃদ্ধি ছাড়াও আসল কারণ সামরিক প্রয়োজন।

সুদূর হিমমণ্ডল ও উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যরক্ষার্থে সরকারকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন কিনতে হচ্ছিল। কারণ এই সব চরম শীত ও উষ্ণ আবহাওয়ায় অনভ্যস্ত সৈনিকদের দেহে কোন কোন খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

তাছাড়া রেডক্রশ প্রতিষ্ঠানও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন কিনে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ-গুলিতে খাদ্যপ্রাণ অভাবগ্রস্ত সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকদের চিকিৎসার্থে পাঠাচ্ছিল। এদের সরবরাহ পরিমাণের মূল্য এক কোটি ত্রিশ লক্ষ ডলার।

সেই বছরেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার জনস্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিলেন। সামরিক সরবরাহ উৎপাদনে কোটি কোটি লোক বিভিন্ন শিল্প ও কারখানায় নিযুক্ত; তারওপর দেশে চিকিৎসকের অভাব, অনেকেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিদেশে চলে গিয়েছেন। সরকার দেখিলেন এই সময় জনস্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত দরকার যাতে সহজে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে না পারে। সরকারি নির্দেশে খাদ্য উৎপাদক কারখানাগুলি খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে কৃত্রিম ভিটামিন মিশিয়ে দিতে লাগল যাতে গুদামে জমা হয়ে বা তৈরি করবার সময় যে খাদ্যপ্রাণ খোয়া যায়, সেটুকু পূরণ হয়। ময়দাকল-ওয়ালা ও রুটি তৈরির কারখানাগুলি প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স কিনে ময়দা ও রুটিতে মেশাতে লাগল। কতকগুলি মৃদু পানীয় ভিটামিন-সি মিশ্রিত করে তৈরি হতে লাগল। ওলিওমারগারিন ভিটামিন-এ মিশ্রিত হয়ে তৈরি হল। ডেয়ারির দুধে ভিটামিন ডি মিশিয়ে পুষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করা হল।

ইতিমধ্যে গবেষণার আরো অনেক নতুন নতুন তথ্য জানা গেল। আজকাল ডাক্তাররা পুষ্টি অভাবজনিত রোগ ছাড়াও অন্যান্য রোগে ভিটামিন প্রয়োগ করবার চেষ্টায় আছেন।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ছেলেটি এমন একটা রোগে আক্রান্ত, যা সচরাচর চোখে পড়ে না। পাঁচ বছর বয়সে তার পায়ের পেশীও কণ্ডরাগুলি আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে জমাট বাঁধতে লাগল। কোন অজ্ঞাত কারণে দেহে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম তৈরি হয়ে সঞ্চিত হচ্ছে। ডাক্তাররা এই অতিশয় বিরল রোগটি সম্বন্ধে অবহিত থাকলে আরোগ্যের উপায় জানতেন না।

তাঁদের এতে কিছুই করবার নেই। আস্তে আস্তে সমস্ত শরীর জমাট বেঁধে পাথরের মত শক্ত হয়ে যাবে অবশেষে সব যন্ত্রণার অবসান হবে মৃত্যুতে। তাহোক, দেখা যাক না কী দাঁড়ায়!—হতাশ হয়ে ডাক্তাররা সরে দাঁড়ালেন না। সেটা ১৯৪৩ সাল। ছেলেটির অসুখ এত বেড়ে উঠেছে, সে হাটতে পারছে না! বাপ-মা তাকে চিকাগোর চিলড্রেনস মেমোরিয়্যাল হাসপাতালে নিয়ে এলেন।

ছোট ছেলেটি মাকে বলল,—মা, হাসপাতালের ডাক্তাররা বোধ হয় আমাকে ভাল করে দেবেন, নয়?—অন্য ছেলেপিলেদের মত বেড়াতে ও দৌড়াতে তার প্রাণটি আঁকু-পাঁকু করছিল।

মা অতি কষ্টে চোখের জল চেপে রেখে বললেন—ভাল হবে বৈকি! সেইজন্যেই ত হাসপাতালে নিয়ে এলুম! কিছুতেই মুখ ফুটে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারলেন না।

হাসপাতালে ডাক্তাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। পা অস্ত্রোপচার করে কণ্ডরাগুলির জট খুলে দিলেন, জমাট-বাঁধা ক্যালসিয়াম বের করে দিলেন—এর জন্যেই দেহ নিরেট শক্ত হয়ে ওঠে। তারপর রঞ্জন-রশ্মি প্রয়োগ করলেন কিন্তু কোন উন্নতিই দেখা গেল না। এমন কি কয়েক বছর চিকিৎসার পরেও দেখা গেল অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছে।

তারপর ডাক্তাররা স্থির করলেন ভিটামিন ই প্রয়োগ করে দেখবেন, কারণ পেশীতন্ত্রের ওপর এর প্রভাব যথেষ্ট। হয়ত এতে ওর কিছুটা উপকার হতেও পারে! আর কিছুমাত্র উপকার পেলেও তাঁদের চেষ্টা সার্থক হবে।

তাঁরা রোগীর শরীরে উগ্রমাত্রায় ভিটামিন ই প্রয়োগ করতে লাগলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে তার সামান্য পরিবর্তন দেখা গেল। এরপর এই চিকিৎসাই চলল। ক্রমে আশ্চর্যরকম উন্নতি হল—ছেলেটি আস্তে আস্তে সেরে উঠতে লাগল। ক্রমে পেশী ও কণ্ডরায় জমানো ক্যালসিয়াম বাগ মানল ও কমে যেতে লাগল।

জড় পাথরের মত পায়ের অনড় অবস্থা কেটে গেল। অবশেষে সবাইকে অবাক করে ছেলেটি তার পা নাড়া চড়া করে দেখাল।

তারপর একদিন সকালে একজন ডাক্তার তাকে দেখতে এলে ছেলেটি বলল—

ডাক্তার বাবু, আজ একটু হেঁটে দেখব!

ডাক্তার বললেন—নিশ্চয়, এস চেষ্টা করে দেখা যাক! ডাক্তার নার্সের সাহায্যে ছেলেটিকে তুলে ধরলেন। তাঁদের ওপর ভর দিয়ে সে সাগ্রহে পা বাড়াল। একটু হাঁটতেও পারল! গত ১০ বছরে এই প্রথম সে একটু হাঁটল!

চোখ দুটো তার উৎসাহে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমি অন্য ছেলেদের মত নিশ্চয়ই হাঁটতে পারব, নয়?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই

ডাক্তার ও নার্স আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এতদিন তাঁরা এই বালকটির জন্যে এত যত্ন নিয়ে খেটে আজ অসম্ভব ভাল ফল পেয়েছেন।

ডাক্তার বললেন—আর কিছুদিন পরে তুমি এ . নিজে নিজেই

হাঁটতে পারবে এবং আমার মনে হয় বছর দুই পরে অন্যান্য ছেলেদের মত খেলা, দৌড়ঝাঁপ, ছুটাছুটি সবই করতে পারবে। তবে দেখ, অধৈর্য হয়ো না, তাড়াতাড়ির কিছু নেই, এত বছর ধরে তুমি এই রোগে ভুগছ এখন সম্পূর্ণ সারতে কিছুটা সময় লাগবে বৈকি!

শেষ পর্যন্ত ভিটামিন ই রোগটি সারিয়ে দিল। আর এই ছেলেটিকে সারাতে গিয়ে, শরীরে অতিরিক্ত জমানো-ক্যালসিয়ামের ওপর ভিটামিনের ক্রিয়া লক্ষ করতে গিয়ে ডাক্তাররা অনেক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন এবং মনুষ্য শরীরে খাদ্যপ্রাণের উপযোগিতা কতদূর, অবহিত হলেন। নতুন নতুন খাদ্যপ্রাণের সন্ধান এখনো প্রতিনিয়তই চলছে। সম্প্রতি ভিটামিন বি-১২ আবিষ্কার হয়েছে এবং ব্যবহারও শুরু হয়েছে। কতকগুলি সাংঘাতিক রকমের রক্তশূন্যতায়—যা এতদিন সারানো সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল, বেশ উপকার পাওয়া যাচ্ছে।

ভবিষ্যতের মণিকোঠায় আরো কত অত্যাশ্চর্য জিনিস মানুষের আবিষ্কারের অপেক্ষায় লুকানো আছে! এই খাদ্যপ্রাণগুলি সম্পর্কেও বহু খবর আমাদের এখনো অজ্ঞাত রয়েছে। এই নিয়ে গবেষণা এখনো চলছে।

ভবিষ্যতের তোরণ

মনুষ্য উদ্ভাবিত সর্ববিধ্বংসী অস্ত্র হিসেবে আণবিক বোমা চরম আবিষ্কার হলেও তার ভেতর গঠনমূলক কল্যাণকর শক্তি নিহিত আছে। আণবিক শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্র দিয়েই আজকাল তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক তৈরি হচ্ছে যা চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তর সৃষ্টি করবে। ডাক্তাররা এই নতুন তৈরি তেজস্ক্রিয় পদার্থ আজকাল কোন কোন রোগ চিকিৎসায় ব্যবহার করছেন, কতকগুলিকে রোগ-বীজাণু নির্ণয়ের অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করছেন।

নবাবিষ্কৃত রসায়নের মধ্যে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ও তেজস্ক্রিয় ফসফরাস এই দুটো জিনিস আজকাল রোগ চিকিৎসার জন্যে উৎপাদন করা হচ্ছে। বিশেষ করে কর্কট রোগে তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের উপকারিতা উল্লেখযোগ্য। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যান্সার দমনে এটি খুবই কার্যকরী।

থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রিয়াই হল রক্ত-প্রবাহ থে. আয়োডিন আত্মস্থ করা, কাজেই আরোগ্যকারী তেজস্ক্রিয় আয়োডিন প্রয়োগ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সরাসরি পীড়িত গ্রন্থিতে গিয়ে ক্রিয়া শুরু করে। চিকিৎসা মোটেই জটিল নয়। অতি সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয় আয়োডিন জলে মিশিয়ে পুরো এক গ্লাস রোগীকে পান করতে দেওয়া হয়। ডাক্তারের নির্দেশানুযায়ী কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর নিয়মিত ব্যবহার করতে হয়।

কর্কট রোগে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ব্যবহার নতুন হলেও এখন আর নেহাত পরীক্ষামূলক বলা চলে না। বিভিন্ন হাসপাতালে

অনেকগুলি রোগীর থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যান্সার এইভাবে প্রতিরোধ করা হয়েছে। তবে ক্রিয়া স্থায়ী কিনা এখনো বলা যায় না, কিন্তু যতটুকু সুফল পাওয়া গেল তার মূল্যই অনেক।

তেজস্ক্রিয় আয়োডিন পারমাণবিক চুল্লীতে তৈরি করা হয়। কোন ডাক্তারের কাছ থেকে ফরমাস এলে তখন তৈরি হয়। আগে থেকে কখনো বেশি পরিমাণে তৈরি করে মজুত রাখা হয় না। কারণ ক্রমাগত বিকিরণ হবার ফলে আটদিনের মধ্যেই তার অর্ধেক শক্তি উড়ে যায়, বাকিটুকুও আরো দিন আষ্টেক পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তেজস্ক্রিয় বস্তুটি চুল্লী থেকে নামানো মাত্র পরিস্রুত জলে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর মিশ্রণটি কাচের বোতলে পুরে, সীসার আধারে রেখে আবার কাচের বাকসে ভাল করে বন্ধ করতে হয়। ফলে সরবরাহের সময় বিকিরণ প্রভাবে কারো কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। এরকম সাবধানতা অবলম্বন করা বিশেষ দরকার। কারণ বৈজ্ঞানিক বা ডাক্তার কর্তৃক যথাযথ নিয়ন্ত্রিত না হলে বিকিরণ শক্তির প্রভাবে সমূহ ক্ষতি হতে পারে।

আয়োডিন অনেক সময় এরোপ্লেনে দূরবর্তী শহরেও পাঠানো হয়। হাসপাতালের লোক আগে থেকেই নির্দিষ্ট জায়গায় প্রস্তুত থাকে। তাই ফরমাস মত জিনিসটি পৌছনো মাত্র নিয়ে আসতে পারে। এইভাবে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন তৈরি হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে।

নবাবিষ্কৃত বস্তুটি কয়েকপ্রকার কর্কট রোগে কার্যকরী হওয়ায় আরো নতুন নতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনা সূচিত হল। ইতিমধ্যে বহু জিনিস নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এদের কোনটি দিয়ে অন্যান্য দুরারোগ্য কর্কট রোগগুলিও দমন করা যাবে। শরীরে একটি গ্রন্থি যেমন আয়োডিন গ্রহণ করে

অন্যান্য অংশও তেমনি কোন না কোন রাসায়নিক গ্রহণে সক্ষম। সেগুলিকে তেজস্ক্রিয় করে এবং নির্দোষ প্রয়োগ পদ্ধতি আবিষ্কার করে সহজেই যে কোন প্রকার মারাত্মক কর্কট রোগ ঘায়েল করা যাবে। যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক পারমাণবিক চুল্লী স্থাপিত হওয়ায় এখন চিকিৎসার্থ তেজস্ক্রিয় পদার্থ কম খরচে তৈরি করার সুযোগ হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় নির্দেশকের কাজ ভিন্ন হলেও রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এর উপযোগিতা কম নয়। আক্রান্ত দেহে খুব অল্পপরিমাণ নির্দোষ তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রয়োগ করার ফলে রোগবীজাণুগুলি তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। তখন ডাক্তার বা বিজ্ঞানীরা অতি সহজেই আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে বীজাণুগুলির গতি নির্ণয় করে রোগ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। গবেষণার উপযুক্ত আইসোটোপ বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ আজকাল যে কোন পরিমাণে পাওয়া সহজ।

কতকগুলি রোগ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা বছরের পর বছর বহু অনুসন্ধান করেও কোন জীবাণু বা সংক্রমণ পদ্ধতি অথবা কী ভাবে বাড়তে বাড়তে মারাত্মক হয়ে ওঠে, কোন হদিশই পাননি। এই সমস্ত মারাত্মক ব্যাধির ভেতর শিশু পক্ষাঘাত ও কর্কটরোগ অন্যতম। আজকাল ডাক্তাররা এই সব রোগের রহস্য ভেদ করবার জন্যে তেজস্ক্রিয় পরমাণু ব্যবহার করছেন, এবং আশা করেছেন অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে এই সব মারাত্মক রোগ নিবারণ ও নিরাময়ের উপায় বের করতে পারবেন।

সুইডেনের অন্তঃপাতী স্টকহোলমের জৈব-রসায়ন গবেষণাগারের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডাঃ জর্জ হেবসিই প্রথম বীজাণু পরীক্ষার জন্যে নির্দেশক ব্যবহার করেন। পারমাণবিক যুগের আধুনিক সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হবার ত্রিশ বৎসর আগে তিনি তাঁর এই

গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি বিসমাথ এবং সীসা ব্যবহার করলেন জীবাণুর গতিবিধি নির্ধারক হিসাবে। তবে এমনভাবে ব্যবহার করলেন যাতে শরীরে কোন ক্ষতি না করে অথচ কাজ করা সম্ভব হয়। অবশ্য তেজস্ক্রিয় পারমাণুনির্দেশকের মত এতটা কার্যকরী হয়নি।

এই গবেষণাক্ষেত্রে পথিকৃৎ হিসেবে ডাঃ হেবসিকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হল। ১৯৪৭ সালে আণবিক শক্তির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। বর্তমান আমেরিকার পারমাণবিক উৎপাদন সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ও সুবিপুল দ্রব্যসম্ভারের মাত্র একাংশ দেখেই তিনি বলে উঠলেন—বাঃ! এ যে দেখছি বিজ্ঞানের চরম উন্নতি! কয়েক বছর আগে গবেষণাক্ষেত্রে এই তেজস্ক্রিয় রাসায়নিকগুলি ব্যবহার করবার সুযোগ পেলে তিনি সর্বস্ব পণ করতে রাজি ছিলেন। এর পরে যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ওয়াশিংটনস্থিত জাতীয় স্বাস্থ্য অন্তর্গত সংস্থা তেজস্ক্রিয় পদার্থের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নতুন আবিষ্কার ঘোষণা করলেন। সেটা হল তেজস্ক্রিয় পেনিসিলিন। রোগবীজাণুর বিরুদ্ধে শরীর কী বিভিন্ন উপায়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে তার সম্যক পরিচয় এই তেজস্ক্রিয় পরমাণুর সাহায্যে বিজ্ঞানীরা পাবেন বলে আশা করেন। তাছাড়া পেনিসিলিন সম্পর্কে আরো নতুন নতুন তথ্য জানা যাবে। ডাক্তাররা রোগীর শরীরে প্রযুক্ত তেজস্ক্রিয় পেনিসিলিনের গতিবিধি কার্যকলাপ লক্ষ করতে পারবেন। জানতে পারবেন পেনিসিলিন দেহে সঞ্চারিত হওয়ার পর শরীরের বিভিন্ন অংশে কতটুকু সঞ্চিত থাকে, কত ক্ষণেই বা শরীর থেকে নিষ্কাশিত হয়ে যায়!

স্তূপীকৃত পরমাণুগুলি কংক্রিটের পুরু দেয়ালযুক্ত ঘরে রাখা হয়। বাইরে থেকেই সব কিছু মেশিনে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। কারো ভেতরে যাওয়া দরকার হয় না।

গবেষণা ও রোগ চিকিৎসার জন্যে যে সব পারমাণবিক উপকরণ দরকার; পরমাণু বিস্ফোরক যন্ত্রে দুইটি পদ্ধতিতে তা তৈরি করা হয়। বস্তুটি যন্ত্রের ভেতর স্থাপন বা পুরু দেয়ালের সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে রাখা হয় যাতে উক্ত পথে নিষ্ক্রান্ত নিউট্রনের দ্বারা বিস্ফোরিত হয়। অবশ্য যন্ত্রের মধ্যে যে তেজস্ক্রিয়তা বিকিরণ হতে থাকে মাঝে মাঝে তার পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং প্রয়োজনমত যাতে খোলা ও বন্ধ করা যায় সেজন্যে একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র রাখা হয়।

বর্তমান যুগে ক্যান্সার রোগ বিজয়ে অনেকখানি অগ্রগতি হয়েছে বলা যায়। কতকগুলি ক্যান্সারে প্রথম অবস্থায় অস্ত্রোপচার এবং বিকিরণ চিকিৎসা অমোঘ। তাছাড়াও কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। এদের কতকগুলি ক্যান্সার আক্রান্ত কোষগুলির বৃদ্ধি সাময়িকভাবে বন্ধ করে, কতকগুলি আবার সম্পূর্ণভাবে দমন করতেও সক্ষম কিন্তু ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার দরুন এখনো পূর্ণ ব্যবহার উপযোগী হয়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও অগ্রগতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ এই কয়েক বছর আগেও এ ধরনের কোন রাসায়নিকের জ্ঞান কারো ছিল না। চিকিৎসায় তিনটি প্রধান রসায়ন ব্যবহার হয়: (ক) হরমোন, (খ) কোষবিধ্বংসী যৌগিক এবং (গ) আর কতকগুলি যাদের এন্টিমেটাবোলাইটিস বলা হয়। অবশ্য নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা আরো চলছে। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির অর্থে পুষ্ট বা পরিচালিত অধিকাংশ ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রগুলি বিপুল উদ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

নিউইয়র্কে স্লোয়ান-কেটারিং ইনস্টিটিউট-এ ও বস্টনের শিশু-হাসপাতালে এই সব রসায়নের অনুসন্ধানের জন্যে বিশেষ কার্যসূচী অবলম্বন করা হয়েছে। হাজার হাজার রাসায়নিক প্রথম পরীক্ষা করে কার্যকরী মনে হলে ইঁদুরের ওপর প্রয়োগ করা হয়। যদি ফল

ভাল দেখা যায় এবং কোন ক্ষতিকর নয় মনে হয়, তখন রোগাক্রান্ত মানুষের ওপর প্রয়োগ করা হয়। হিসেব করে দেখা গেছে রসায়ন-বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা-যোগ্য পাঁচলক্ষ বিভিন্ন রাসায়নিক নিয়ে গবেষণা করছেন। আর এই বিপুল সংখ্যক দ্রব্যের মধ্যে কোন না কোনটি অথবা একাধিক রাসায়নিক যৌগিক মিশ্রণে একদিন না একদিন সর্বপ্রকার মারাত্মক ক্যান্সার রোগ সম্পূর্ণ জয় করা সম্ভব হবে। লিউকিমিয়া বা রক্তের ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা এখনো বিশেষ-ভাবে পরীক্ষাধীন আছে। এ রোগে শিশুরা প্রায়ই ভোগে। একটি নবাবিষ্কৃত রাসায়নিক ব্যবহারে এই রোগে কিছুটা উপকার পাওয়া গিয়াছে। অ্যামিনোটারিন ব্যবহারে লিউকিমিয়া আক্রান্ত ক্যান্সার কোষগুলি বিনষ্ট করতে সক্ষম হলেও দেখা গেছে সুস্থ স্বাভাবিক রক্ত-কোষের ক্ষতিকারক। অল্প কয়েকবার ব্যবহার করা চলে কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য সম্পাদন হয় না। তারপর ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ আর্নল্ড ওয়েলস ও সহকর্মীরা একটি যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করলেন। তার নাম ৬-এজাথাইসিন, অ্যামিনোটারিনের সঙ্গে এইটি মিশিয়ে ব্যবহারের ফলে এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠা গেছে। হয়ত আরোগ্য পথের এটি আর এক ধাপ।

যক্ষ্মা নিবারণ গবেষণায় অসংখ্য ওষুধের পরীক্ষা করা হয়েছে। অবশেষে ১৯৫১ সালে আবিষ্কৃত হল স্ট্রেপ্টোমাইসিনের সঙ্গে প্রযোজ্য PAS নামক একটা ওষুধ, যুক্তভাবে ব্যবহার করলে শুধু স্ট্রেপ্টোমাইসিনের চেয়ে ঢের বেশি ফলপ্রসূ হয়।

আর্থ্রাইটিস, রক্তের ক্যান্সার ও আরো কতক কতক রোগে কোর্টিসন খুবই উপকারী। গবাদি পশুর পিত্তরস নিঃসৃত এই ওষুধের উৎপাদন পদ্ধতি ভয়ানক জটিল ও ব্যয়সাধ্য। চারহাজার পশুর পিত্ত থেকে মাত্র এক গ্রাম ওষুধ পাওয়া যায়। আজকাল

অবশ্য বিজ্ঞানীদের দৌলতে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। হার্ভার্ডের ডাঃ রবার্ট বি উডওয়ার্ড এই রাসায়নিক সংশ্লেষকার্যের প্রথম ধাপ এগিয়ে দেন। ডাঃ লুইস এইচ. সারেট এবং তাঁর সহকর্মীগণ মারেক ল্যাবরেটরিতে প্রথম সংশ্লেষ পদ্ধতিতে আংশিকভাবে কোর্টিসন তৈরি করেন। তারপর অন্যান্য আরো অনেক বিজ্ঞানীর অক্লান্ত চেষ্টায় কৃতকার্য হওয়া সম্ভব হয়েছে।

বীজাণু ও ভাইরাস পর্যবেক্ষণের ও গবেষণার নতুন সহায়ক হিসেবে পাওয়া গেল অত্যন্ত শক্তিশালী ইলেক্‌ট্রনিক মাইক্রোসকোপ। অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস এতদিন বিজ্ঞানীদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছিল, তাঁদের এই যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়ল। পেশীস্তরে দূষিত কোষগুলিও এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। কারণ যন্ত্রের নিচে কোষগুলিকে দুই লক্ষ গুণ বড় দেখায়, পোলিও, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ও ক্যান্সার কোষ পরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য অজানা রোগ বীজাণু পর্যবেক্ষণেও একদিন সহায়ক হবে।

ভিটামিনের নতুন নতুন ব্যবহারও আবিষ্কার হচ্ছে। ভিটামিন-কে, বা বি-১২ প্রভৃতি নতুন কয়েকটি খাদ্যপ্রাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। আরো নতুন নতুন বের হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগান্তকারী নবাবিষ্কৃত ওষুধগুলি এখনো বিভিন্ন দেশের ল্যাবরেটরিতে ক্রমাগতই পরীক্ষিত হচ্ছে।

সত্যিকার বিশ্বজনীন বলতে মনীষাকেই বোঝায়, এবং সেই হিসেবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বিশ্বমানব। তাঁদের অবদান কোন ভৌগলিক সীমায় কখনো আবদ্ধ থাকে না। বিশ্বজনহিতে সবাই একযোগে কাজ করেন। বহু মানবের দীর্ঘ জীবনব্যাপী দুশ্চর সাধনায় রচিত হয়েছে এক একটি জ্ঞান-সৌধে দৃঢ় ধাপ। বহু-

ধাপে রচিত সিঁড়ি বেয়ে সৌধশীর্ষে চড়ে যা পাওয়া গেল, সমস্ত পৃথিবী উপকৃত হল।

দিনের পর দিন এমনি চলছে নিরলস অনুসন্ধান। ছত্রক, ঈস্ট ও অন্যান্য জীবাণু গবেষণাগারে এ সবই এক একটি মনোরম বৈচিত্র্যময় জগত।

সমুদ্রের জলজ জীবাণু নিয়েও গবেষণা হচ্ছে, সেগুলিও নাকি ক্যান্সার বিজয়ে সহায়ক হবে। ক্যালিফোর্নিয়ার স্ক্রিপস ইনস্টিটিউটের অর্ণববিদ ডাঃ ফ্রেডারিক সিসলার ও ক্লদ ই. জোবেল সামুদ্রিক সেই সব জলজ জীবাণু—যারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকারী ভূমিজ জীবাণুদের মত জলে পতিত মৃতদেহ বা লতাপাতা পচিয়ে নষ্ট করে, তাদের নিয়ে গবেষণা করছেন।

আজকালকার গবেষণার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, জীবজগত বা জড়পদার্থ সর্বত্রই প্রোথিত বস্তুর অনুসন্ধান। সমগ্র প্রকৃতিই এখন একটি জ্ঞানান্বেষণের বিস্তৃত ক্ষেত্র। যতই বৈজ্ঞানিকরা মানুষের জীবনরক্ষায় আগ্রহশীল হয়ে এই ক্ষেত্রের দিকে সন্ধান-তৎপর হয়ে এগোবেন ততই নব নব জ্ঞান-রূপ সমৃদ্ধ শস্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। ফলে ভবিষ্যত মানুষের জীবন সুখ, সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।